# হিংলাজের পরে

অবধূত

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

তৃতীয় মুদ্রণ
ডিসেম্বর ১৯৬২

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশি
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক মু

পরমসুহৃদ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের

করকমলে

১৩৫৩ সাল ভাদ্র মাস।

করাচীর কূল থেকে প্রকাণ্ড একখানি পালের নৌকা তীব্রবেগে ছুটে গেল সমুদ্রের বুকে, কারণ পালে জোর হাওয়া ধরেছিল। পালে হাওয়া ধরলে নৌকা ছুটবেই, দোষটা হাওয়ারও নয় নৌকারও নয়। শেষ পর্যন্ত দোষটা দাঁড়িয়ে গেল আমার, কারণ সেই নৌকায় আমি ভেসে পড়েছিলাম।

তার পর থেকে আজও ভাসছি।

১৩৬২ সাল শ্রাবণ মাস।

আত্মপ্রকাশ করল এক কাহিনী—মরুতীর্থ হিংলাজ। সে কাহিনী যাঁরা পড়লেন, তাঁরা মাথা ঝাঁকিয়ে রায় দিলেন, শেষ হল না, জের রয়ে গেল।

হাওয়া চিরকাল এক ভাবে বয় না, সমুদ্রটাও অফুরন্ত নয়। সমুদ্রের এ-কূল ও-কূল দু কূল আছে। কোথায় গিয়ে পৌঁছল সেই নৌকা, কেমন করে পৌঁছল, পৌঁছবার পরে কি হল না হল, সে সব কাহিনী গেল কোথায়? নৌকা ছুটল আর ফুরিয়ে গেল, একি একটা কথার মত কথা! কোথাও কোনও কূলে ভিড়েছিল নিশ্চয়ই সেই তরী, তার পর থেকে শুনতে চাই। ফাঁকি দিলে চলবে না।

১৩৬৯ সাল পৌষ মাস।

আর এক কাহিনী আত্মপ্রকাশ করছে—হিংলাজের পরে। ১৩৫৩ সালের ভাদ্র মাসে যে নৌকাখানা করাচীর কূল ছেড়ে সমুদ্রের বুকে উধাও হয়েছিল, সেই নৌকার বরাতে ষোল বছর পরে একটা কূল মিলছে।

এই কাহিনীটির নাম—হিংলাজের পরে। সবাই জানেন, মহাপীঠ দর্শনের পরে ভৈরব দর্শন করতে হয়। কালীঘাটের কালীকে দর্শন করে দেখতে হয় ভৈরব নকুলেশ্বরকে, কামাখ্যা দর্শন করে দেখতে হয় ভৈরব উমানন্দকে। এও তেমনি। দেবী হিঙ্গুলাকে দর্শন করে দেখতে হবে ভৈরব কোটেশ্বরকে। নয় তো তীর্থদর্শনের ফল পাওয়া যাবে না।

ফলের কথাটা বাদ দেওয়াই ভাল, ওটা এমনই এক পদার্থ যা পেয়েছি বললে ঠকতে হয়, পায় নি বললে তীর্থদেবতা রুষ্ট হতে পারেন। অতএব ফলের কথা মাথায় থাকুক।

সোজা কথায় আওড়ে যাই, তার পর কি ঘটেছিল। যাঁরা হিংলাজ পড়েছেন, এই কাহিনীটি পড়বার পরে তাঁরা যদি মানেন যে এত দিনে জের মিটল; তা হলে বুঝব, ষোলআনা ফল হাতে হাতে পেলাম। ইতি

উত্তরায়ণ সংক্রান্তি ১৩৬৯

# হিংলাজের পরে

১৩৫৩ সাল ভাদ্র মাস।

তারিখটিকে মনে নেই, দিনটিকে ঠিক মনে আছে। কারণ সেই দিনটি ছিল আমার জীবনের সুবর্ণ-দিবস। সেদিন আমি সুবর্ণের সুবর্ণ-আত্মাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

আজও ভুলতে পারি নি সেই অতি-অসম্ভব দৃশ্যটিকে।

প্রকাণ্ড এক অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে প্রকাণ্ড একখানি গোল কড়াইতে লক্ষ কোটি মন সোনা গলে টলটল করছে। কড়াইখানাকে ঘিরে রক্তবর্ণ আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। দম বন্ধ করে তাকিয়ে ছিলাম, প'তি মুহূর্তে আশা করছিলাম পড়ল বুঝি খানিক সোনা উথলে। স'লে উঠল না, কিছুই হল না, আস্তে আস্তে আগুনের আঁচ কমতে গেল। তার পর এক সময় বুঝতে পারলাম, ওটা ফুটন্ত সোনা ভাঝাই কড়াই নয়, ওটা একটা মস্ত বড় সোনার থালা। ওর জল্লাটাই ফুটন্ত সোনার মত। অনেকক্ষণ চোখের সামনে সোজা খাড়া হয়ে রইল সোনার থালাখানা, তার পর তার তলার দিকটা একটু একটু করে অদৃশ্য হতে লাগল। ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড চোখের সামনে ধীরেসুস্থে ঘটে গেল। বিভীষণ শক্তিশালী কোনও জানোয়ার কামড়ে ধরল থালার নীচেটা, ধরে তলিয়ে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে সেই জ্বলন্ত সোনার থালা গেল অদৃশ্য হয়ে,তার পর দেখা গেল চতুর্দিকে রক্তের ঢেউ খেলছে। খুব সম্ভব সেই বিরাট থালার তলায় বেকায়দায় পড়ে গিয়ে খুন হল সেই রাক্ষুসে জীবটা, তার অফুরন্ত রুধিরে আদিগন্ত আবিল হয়ে উঠল। ক্রমে সেই রক্ত কালচে হয়ে

জমে উঠতে লাগল। সেই থকথকে কালো খুনের ওপর দিয়ে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলল আমাদের যানখানি। ওপরে শান্তশিষ্ট শিহরিত একখানি আকাশ অগুনতি আঁখি মেলে তাকিয়ে রইল শুধু, তাকিয়ে কি যে দেখতে লাগল তা সেই আকাশই জানে।

কি দেখবে! দেখবার কি আছে! দশদিক জুড়ে নিঃসীম নিঃসম্বল নিস্তব্ধতা বোবা ভাষায় কান্না জুড়ে দিয়েছে। জল—শুধু জল, যুগযুগান্ত ধরে অবিরাম কেঁদে মরছে—অসহায়া প্রকৃতিদেবী। তাঁর নয়নেব নীরে তৈরী হয়ে গেছে অতবড় সমুদ্রটা। জল—শুধু জল, পশ্চিম দিকে যেখানে ফুরিয়ে গেছে ভারতবর্ষ, সেখানে আর কিছুই নেই। দেখবার শোনবার ধরিত্রীর সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ গড়ে তোলবার এতটুকু আশা ভরসা নেই। আকাশ আর ঐ সমু প্রকৃতিদেবীর নয়নের নীরে গড়ে উঠেছে সেই সমুদ্র, ওদের দুজনে বর্ণই এক। স্বপ্ন ওরা দেখে না, ঘুম ওদের চোখে আসে না। ঘুম আশা আকাঙ্ক্ষা সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়ে অনন্তকাল ওরা পরস্পরের পানে বোবা চাউনিতে তাকিয়ে রয়েছে।

১৩৫৩ সাল ভাদ্র মাস।

সাগরের বুকে পাল তোলা নৌকায় শুয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে প্রথম রাতটি প্রায় শেষ করে ফেললাম। ঘুম এল না, স্বপ্ন দেখলাম না, ভারী অদ্ভুত একটা নেশায় বুঁদ হয়ে রইলাম। অনবরত মনে হতে লাগল, আমি মরে গেছি। মরণের পরে অসীম শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি। মাটি আর পাথর, পাথর আর বালি, বালি আর উত্তাপ, ঐ সব কদর্য বস্তুব সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই।

মরেই গিয়েছিলাম। কতক্ষণ কেটেছিল বালির তলায় তা-ই বা কে জানে!

প্রথম হুঁশ ফিরে পান ভৈরবী। হুঁশ ফিরে পাবার পরে কি দেখেছিলেন তিনি? জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং সংক্ষিপ্ততম জবাব পেয়েছিলাম। দেখেছিলেন, কাপড় কম্বল দিয়ে বানানো একটা ঝুপড়ির মধ্যে পড়ে আছেন। ব্যাস, ঐটুকুই শুধু দেখেছিলেন।

জবাবটিতে ছিটে-ফোঁটা ভেজাল নেই। ঐ নির্জলা জবাবটি গলাধঃকরণের পরে ফের কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাওয়াটা নেহাতই বেহায়াপনা। বেহায়াপনা জেনেও আর একটা প্রশ্ন ফসকে বেরিয়ে ইয়েছিল মুখ থেকে— কে কে ছিল সেখানে?

পদ মিলেছিল ঠিক দুটি অক্ষরের জবাব—যম।

সত ঐ জবাব শোনার পরে আর কিছু জানতে চাওয়ার সাহস হয় নি। ে'র কিছু জানতে চাইলে নিশ্চয়ই শুনতে হত—যমকে শুধিয়ে এস গিয়ে।

শখ থাকলেও ঐ কর্মটি করার সামর্থ্য ছিল না। সামর্থ্য থাকলেও প্রবৃত্তি ছিল না। আর একবার সেই বালির সমুদ্র পাড়ি দিয়ে হাব নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছে যমের সঙ্গে মোকাবিলা করার কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

স্বপ্ন নয়, সত্যিকারের ব্যাপারটা আমি জানতে পেরেছিলাম খানিক গুলমহম্মদের কাছ থেকে। গুলমহম্মদ পোপটভাই রূপলাল, ওরা সবাই মিলে যা বাতলেছিল, তার ভেতর থেকে ভাব ভক্তি উচ্ছ্বাসটুকু বাদ দিলে যা থাকে, সেটুকু বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ওরা কি ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল ভৈরবীর কাণ্ড দেখে। হুঁশ ফিরে

পেয়ে একটিবার মাত্র কি যেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন ওদের ভৈরবী, প্রশ্নটা ওরা ঝট করে সমঝে উঠতে পারে নি। আর একবারও ঠোঁট ফাঁক করেন নি তিনি, কোনও রকমে নিজেকে নিজের পায়ের ওপর খাড়া করে টলতে টলতে বেরিয়ে পড়বার চেষ্টা করছিলেন। পথ আগলে ওরা জানিয়ে দিয়েছিল যে স্বামিজীও পড়ে আছেন পাশের ঝুপড়িতে বেহুঁশ অবস্থায়। শুনে কোনও ক্রমে নিজেকে চালিয়ে নিযে গিয়েছিলেন ভৈরবী পাশের ঝুপড়িতে। তার পর আর যাবে কোথায় যম বাবাজী। তাঁকে হিমশিম খাইয়ে পরের দিন সকালেই উর্বশীর পিঠে চড়ে বসেছিলেন ভৈরবী তাঁর সংজ্ঞাবিহীন সম্পত্তিটি সহ। শ্রীমান যম নেহাত বেকুব বনে গিয়ে সেখানেই বসে রইলে কাণ্ডকারখানা দেখে এমনই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন তিনি উর্বশীর পিছু পিছু ধাওয়া করার কথাটা বোধ হয় তাঁর খেয়াল এল না।

অতএব সেই যমই হচ্ছেন আসল প্রত্যক্ষদর্শী, প্রত্যক্ষদর্শ বিবরণ একমাত্র তিনিই দিতে পারেন। জ্ঞান ফিরে পাবার পরে ঘটেছিল তা জানাবার গরজ ভৈরবীর নেই। জানবার শখ থাকে জিজ্ঞাসা করে এস সেই যমটিকে।

অমন বদখত শখ খামকা চাপতেই বা যাবে কেন কারও ঘাড়ে হিংলাজ যাত্রা লিখতে গিয়েছিল যে তারই কর্তব্য বিলকুল বেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাতলানো। সমস্ত যদি ভাল করে জানবার সামর্থ্য থাকে তা হলে ওটা লিখতে যাওয়া কেন ?

হক কথা। সময় স্বাস্থ্য সামর্থ্য খরচা করে বই পড়ে একশ গ

প্রশ্ন যদি মনের ভেতর খচখচ করতে থাকে তা হলে ভ্রূ কোঁচকাবার অধিকার সকলেরই আছে।

আমি কিন্তু নাচার, অকপটে সকলের কাছে নিবেদন করেছি যে আমার তখন হুঁশই ছিল না। তা ছাড়া আর একটা কথাও আছে। হিংলাজ গিয়েছিলাম তীর্থ করতে, বই লেখার ভাবনাটা তখন মনের কোণেও উঁকি দেয় নি। ১৩৫৩ সালের ঘটনাগুলো লিখতে বসলাম ১৩৬১ সালে।

লিখতে বসে টের পেলাম, মগজের ভেতর ঘিলু বলে যেটুকু পদার্থ ছিল তা শুখিয়ে খরখরে বালিতে পরিণত হয়েছে। সম্বল ভৈরবীর স্মৃতিশক্তি, পান দোক্তার রসে সদাসর্বদা ভিজিয়ে রাখার দরুন সেই পদার্থটুকু তাজা থেকে গেছে। ভাগ্যে আছে, তাই হিংলাজ লেখাটা সম্ভব হল। কিন্তু সন্তুষ্ট হলেন না কেউ, কাঁড়ি কাঁড়ি খাম পোস্টকার্ড জমতে লাগল ঘরে। এক দাবি, একই জাতের জিজ্ঞাসা। বল, জলদি বল, তার পর কি হল?

তার পর কি হল, জানাতে বসেছি। ১৩৫৩ সালের ঘটনা, ১৩৬৯ সালে বলতে বসেছি। এই কাহিনীটি শুনিয়েও হয়তো কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারব না। যাঁদের স্কন্ধে ভ্রমণকাহিনী লেখার শখ চাপে, তাঁরা কাগজ কলম ক্যামেরা ঘাড়ে ঝুলিয়ে ভ্রমণ করতে বের হন। ফিরে এসে হুস হুস করে পাতার পর পাতা লিখে ফেলে ছবি-টবি দিয়ে ছাপাতে পাঠান। তাতে খুঁত থাকে না, ভুল থাকে না, আজেবাজে একটি কথা থাকে না। একখানি নির্বিকার নিষ্কলঙ্ক পাকা দলিল হয়ে সেই সৃষ্টি সকলের মন-মগজে জ্বলজ্বল করতে থাকে।

আর এই যে সৃষ্টিটি করতে বসেছি আমি, এটি হতে চলেছে

একটি অনিবার্য অনাসৃষ্টি কাণ্ড। ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার—এই অপূর্ব উপমাটি চমৎকার খাপ খায় আমার এই অনাসৃষ্টি কাণ্ডটির সঙ্গে। একদা যখন ঝুলি ঘাড়ে নিয়ে পথে-বিপথে ঘুরে ঘুরে দিন গুজরান করতাম, তখন কোথায় ছিল কাগজ-কলম, কোথায়ই বা ছিল ইনিয়ে বিনিয়ে গল্প বলার মত মেজাজ। অতি নিষ্ঠুরা ধরিত্রীর বুকে টিকে থাকতে হলে ফিকির একটা চাইই-চাই। ফিকির খুঁজতে গিয়ে সর্বপ্রথম যেটি নজরে পড়ে যায়, সেটির নাম ভিক্ষা করা। একেবারে নেহাত নিরীহ জাতের পেশা। ভিক্ষা হয় মিলবে নয় তো মিলবে না। বড়জোর কয়েকটা কড়া সত্যি কথা শুনতে হবে। একদা সর্বঝঞ্ঝাট থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় ঐ নেহাত নিরীহ জাতের পেশাটি আঁকড়ে ধরেছিলাম। তার পর একদা আঁতকে উঠলাম আবিষ্কার করে যে, ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করতে হলেও কোনও না কোনও ফিকিরের আশ্রয় নিতে হয়। সেই সমস্ত ফিকিরের মধ্যেও আবার শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। অন্ধ সাজা, খোঁড়া হওয়া, বোবা কালা পাগলা বনে গিয়ে কিম্ভূতকিমাকার ভাবের-অভিব্যক্তি দেখানো —এ সব কায়দাগুলো একেবারে নীচু শ্রেণীতে পড়ে। দেশের এবং দশের সেবা করাটা একচেটিয়া কারবারে দাঁড়িয়ে গেছে বড় বড় মঠ আশ্রমওয়ালাদের। হরদম বন্যা মহামারি লাগছেই বা কই যে ওই নিয়ে নতুন কোনও প্রতিষ্ঠান খোলা যায়! একমাত্র পন্থা, কোনও রকমে শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতখানা গড়গড় করে নিয়ে উলটো-পালটা বোলচাল ঝেড়ে লোকের আধিদৈবিক আধিভৌতিক যন্ত্রণাগুলোর গায়ে ফুঁ দিয়ে শ্রীশ্রী একশ আট শ্রী বনে গিয়ে ঢুলঢুল দশায় বেঁচে থাকা। কিন্তু সবাই কি আর সর্বক্ষণ ভিটকিলিমি সম্বল

করে বেঁচে থাকতে পারে। ভিক্ষা পাওয়ার যতগুলো ফিকির নজরে পড়ল, তার মধ্যে কোনওটাই তেমন সোজা বা সহজ বলে মনে হল না। অগত্যা নতুন পন্থা বার করতে হল বুদ্ধি খেলিয়ে। পন্থাটিতে গোঁজা-মিল একটু রইল বটে কিন্তু গোস্তাকি কিছু রইল না। সোজা মতলব তীর্থ করে বেড়াচ্ছি। এতবড় দেশটার গাঁটে গাঁটে তীর্থ। তীর্থে তীর্থে ছয়লাপ আসমুদ্রহিমাচল এই পুণ্যভূমিটি। সুতরাং কোন্ বেকুবে বলতে পারে যে তীর্থ ভ্রমণ করে জীবনটা গোল্লায় দিচ্ছ।

তীর্থভ্রমণ সর্ববাদীসম্মত একটি পুণ্য কর্ম। সর্বস্ব ত্যাগ করে যারা ঐ পুণ্য কর্মটি অবলম্বন করেছে, তাদের সম্বন্ধে অনাবশ্যক মন্তব্য করা শালীনতা-বিরুদ্ধ। তা ছাড়া সংসার বন্ধনে আটকে পড়ে যাঁরা মুক্তির স্বপ্ন দেখেন, তাঁরা তো তারিফ করবেনই বন্ধন-মুক্ত সংসার-ত্যাগীদের। আহা, কি সুখেই না ঘুরে বেড়ায় ওরা! যে আশাটা কিছুতেই মিটল না নিজেদের, সেটা যারা চেখে চেখে ভোগ করেছে, তাদের সমীহ করে না কে! সমীহ করলেই সাহায্য করতে হয়, কাজেই ভিক্ষে দেওয়াটা সসম্ভ্রমে সাহায্য করায় দাঁড়িয়ে যায়। ফলে অনাবশ্যক ফালতু কথা আর ফিচেল বুদ্ধি খরচা না করেও অনায়াসে ঘুরে বেড়ানো যায়। তবে হ্যাঁ—পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর কষ্টটুকু ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

অভিনব পন্থায় ভিক্ষে করে জীবনধারণ করার গরজে ঘুরে বেড়িয়েছি তীর্থে তীর্থে। তাতে তীর্থের ফল কতটুকু সঞ্চয় হয়েছে, তার হিসেব তীর্থদেবতাদের জিম্মাতেই জমা হয়ে আছে। ও নিয়ে কখনও মাথা ঘামাই না। অকস্মাৎ একদিন কিন্তু আবার আবিষ্কার করে বসল্যাম্ যে তীর্থগুলো ফুরিয়ে গেল। অগত্যা থামতে হল।

থামার পরে আবার ফিকির খুঁজে মরতে হল। টিকে থাকা চাই তো কোনও রকমে।

ভাগ্য ভবিতব্য বা নিয়তি, কার কারসাজিতে ঠিক বলতে পারব না, জুটে গেল এক কলম। পেয়ে গেলাম কয়েকখানা সাদা কাগজ। তার পর একেবার অযাচিত ভাবে যিনি এসে দাঁড়ালেন সামনে, তাঁর নামটি উল্লেখ করার সাহস নেই। বাগ্‌দেবীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন নিজে। সেই সিদ্ধির এক কণা কৃপা করে দান করলেন আমায়। বরাভয় মুদ্রায় আশীর্বাদ করলেন ব্রাহ্মণ—ভয়কে জয় কর, সংশয় পরিত্যাগ কর। জীবনকে যে ভাবে দেখেছ, যেমন করে জেনেছ, তাই শোনাও। তোমার পথ নির্বিঘ্ন হোক।

সেই আশীর্বাদটুকু সম্বল করে কলম চালিয়ে যাচ্ছি। ফলে এতগুলো দিন আস্তানার তলায় মাথা গুঁজেই কেটে গেল। এ কি কম লাভ নাকি!

লোকসানও কম নয়। এখন ঘরে বসে মনের নোলাকে সংবরণ করা দায়। করাচীর কূল থেকে সেই যে পাল-তোলা নৌকাখানির ওপর উঠে অনন্ত দরিয়ায় ভেসে পড়েছিলাম, সেই ভাসাটাকে আর একটি বার চাখবার জন্যে মনের জিভটা লকলকিয়ে উঠেছে। মনের জিভকে মনের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে এই যে কলম চালিয়ে যাচ্ছি, এই কাজটায় আনন্দ যেটুকু আছে তা হল নিখাদ বুক মোচড়ানো আনন্দ। সে দিন আর কখনও ফিরে আসবে না, এই নিষ্ঠুর সত্যিটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কেটে বসছে মনের গায়ে। চালিয়ে যাচ্ছি কলম, বিচক্ষণ মানুষে বিশ্বাস করুন চাই না করুন, তবু অকপটে বলব সাহিত্য

সৃষ্টির গরজে এই পণ্ডশ্রম করছি না। সে সাধ্য আমার ভেতর গজায় নি। আমার গরজ, সেদিনের সেই ব্যথা বেদনা আশা আনন্দের স্বাদ অপরকে একটু দেওয়া। এই দেওয়াতে লাভের ঘরে জমা পড়বে কতটুকু তার হিসেব মনেও পড়ছে না। মনে পড়ছে লোকসানের কথাটা। একান্ত ব্যক্তিগত আশা নিরাশা ভুল ভ্রান্তির এই ফিরিস্তিটা মানুষের সামনে মেলে ধরবার পরে আর নিজের বলে কতটুকু আলাদা হয়ে থাকছে! ফতুর হয়ে যাচ্ছি যে দিন দিন, এর পরে আর কি সম্বল করে বেঁচে থাকব! লোকসান হয়ে যাচ্ছে, সবই খোয়াচ্ছি। জীবনের যা কিছু সঞ্চয়, তার একটা কানাকড়িও বুকের ভেতরে লুকিয়ে রাখতে পারলাম না। সব ফুরিয়ে যাচ্ছে।

সেদিনও ঠিক এই কথাটাই মনে হয়েছিল।

কাঠের পাটাতনের ওপর চিত হয়ে শুয়েছিলাম দু চোখ মেলে। বড় মেজ সেজ ছোট নানা আকারের নানা মাপের অনেকগুলো সাদা পাল অনেক ওপরে আড়াআড়ি লম্বালম্বি কোণাকুণি অবস্থায় পাক খাচ্ছিল ফুলে উঠছিল বা বুক চিতিয়ে এগিয়ে যেতে চাচ্ছিল। তারও অনেক ওপরে আঁধারে আলোয় জড়ানো গাঢ় নীল একখানা চাঁদোয়ার গায়ে মিটিমিটি জ্বলছিল অসংখ্য চুনি পান্না হীরে জহরৎ। প্রচুর ঐশ্বর্য ঝুলছে দুলছে নাগালের বাইরে, প্রচুর বৈভব ডুবে রয়েছে নৌকাখানার নীচে সাগর-গর্ভে। আকাশে ঐশ্বর্য, জলে ঐশ্বর্য, দুনিয়াখানা মাঝখানে পড়ে হ্যাংলার মত ধুঁকছে আর ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হায়রে দুনিয়া!

প্রথম রাতটা পালিয়ে যাচ্ছে।

বাকী থাকবে আরও গোটা পাঁচেক রাত।

সে কটা রাত ফুরিয়ে গেলেই নেমে পড়তে হবে কঠিন মাটির বুকে। তার পর নিজের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ঘুরে মরতে হবে, যে-ঘোরার শেষ কোথায়, তার কোনও সঙ্কেত পাবারও উপায় নেই। অর্থাৎ সবটুকুই ফাঁকি, সমুদ্রটা নৌকাখানা ওপরের ঐ হীরে জহরতে মোড়া আকাশখানা সবই অর্থহীন ছেলে ভুলোনো গল্প। গল্পটুকু ফুরোলেই স্বপ্ন দেখা ফুরোবে। কি বিড়ম্বনা!

ফুরিয়ে যাবে—এই কথাটাই সে দিন সব থেকে বেশী করে মনে হয়েছিল।

বিগড়ে গেল চিত্ত, ফাঁকি দিয়ে বেঁচে থাকাটাকে নির্জলা ফাঁকি ছাড়া আর কিছু মনে করে সান্ত্বনা পেলাম না। লোকসান, আগাগোড়া সব হিসেবটাই সোজা লোকসানের ঘরে জমা হয়ে গেল।

বিলক্ষণ রেগেও উঠলাম। কার ওপর রেগে উঠলাম, ঠিক ধরতে না পারার ফলে রাগটা গিয়ে পড়ল নিজেরই ঘাড়ে। তেড়ে উঠে চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে বসলাম নিজেকে—বলতে পার, কোন চতুবর্গের ফল পাচ্ছ তুমি এ ভাবে দিন-গত-পাপক্ষয় করে?

স্বগত প্রশ্নটার জবাব সশরীরে আবির্ভূত হল ঠিক মাথার কাছে।

ভৈরবী বললেন—নৌকায় চড়ে যাওয়ার দরুন ছটা দিন পেট ভরে মাছ খাওয়া যাবে। এও কি কম লাভ নাকি! ইস্ কতকাল আমরা মাছ মুখে দিই নি।

বলে বেশ লম্বা একটা শ্বাস টেনে নিয়ে সশব্দে সুপুরি কাটতে লাগলেন। অতঃপর লাভ-লোকসানের হিসেবটা সেই কতকাল আগে

খাওয়া ভর্জিত মৎস্যের গন্ধে চাপা পড়ে গেল। এবং তৎক্ষণাৎ সব থেকে জরুরী প্রশ্নটি রসনায় সমুপস্থিত হল—মাছ! কি মাছ?

ফিস ফিস করে জবাব দিলেন ভৈরবী—পারশে—হাতের চেটোর মত চওড়া ডিম ভরা পারশে। কি ছিষ্টির মাছ যে ধরা পড়ছে! ছোট একখানা জাল ঝুলিয়ে দিয়েছে নৌকার পাশ থেকে। নৌকা চলছে, জালও চলছে। মাঝে মাঝে তুলছে জালখানা, এক এক বারে তিন চার সের মাছ উঠে আসছে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সংবাদটুকু জানিয়ে দিয়ে ভৈরবী কর্তিত সুপুরিখণ্ড-গুলো সবেগে নিক্ষেপ করলেন মুখগহ্বরে। বেশ খানিকটা রস জমে উঠল মুখে, সেটুকু টেনে নিয়ে গিলতে যাবার দরুন একটু বেশ আওয়াজও উঠল। সুপুরির দৌলতে নোলার ইজ্জত বাঁচল ভৈরবীর, আমার বাধল ফেসাদ। পারশে, হাতের চেটোর মত ডিম-ভরা পারশে, ওপরে সরষে বাটার প্রলেপ পড়েছে। আহা ঠিক যেন সাধন ভট্‌চায্যি মহাশয়ের কপালখানি। দত্তদের বাড়ি থেকে শ্রীধরের সেবা করে ফিরছেন, নাকের ডগা থেকে শুরু করে টিকির গোড়া পর্যন্ত থক থক করছে সাদা চন্দন। দত্তদের ভক্তি ছিল বেশী, শ্রীধরের জন্যে দেউড়ির চোবেজাকে প্রত্যহ সকালে স্নান করে গামছা সেঁটে আধ সেরী এক রূপোর বাটি ভরতি চন্দন ঘষতে হত। সাধন ভট্‌চায্যি মশাই যতটা পারতেন শ্রীধরকে মাখিয়ে দিতেন। কিন্তু এক হাত প্রমাণ কষ্টি-পাথরের শ্রীধরের সেই ছোট্ট শ্রীঅঙ্গে অতটা চন্দন বাটা লেপটানো যাবে কেন। অগত্যা উদ্‌বৃত্তটুকু নিজের কপালে আর টাকে চড়িয়ে ফেলতেন ভট্‌চায্যি মশাই। সরষে বাটার প্রলেপ দেওয়া পারশের কথা মনে পড়তেই ভট্‌চায্যি মহাশয়ের সেই মুখখানিকে মনে পড়ে

গেল। সেই সঙ্গে মনে পড়ল আমাদের রান্নাঘরের দাওয়াটাকে। আমাদের বাড়িতে সত্যনারায়ণের সেবার পর সেই দাওয়াতে বসেই ভট্‌চায্যি মশাই জলযোগ সমাধা করতেন। আবার সেই দাওয়াতে বসেই পুজোর সময় আমরা সরষে-বাটা দেওয়া পারশে মাছের ঝাল সহযোগে এক রাশ গরম ভাত গিলে উঠতাম। হাতের চেটোর মত ডিম ভরা পারশে, পাশাপাশি দুটি শুয়ে আছে থালার এক পাশে, ওপরে তেল সরষে বাটা কাঁচা লঙ্কা বেশ পাতলা করে ছড়িয়ে রয়েছে, এবং সর্বোপরি আলতো ভাবে ছিটিয়ে রয়েছে তাজা কয়েকটা ধনে পাতা। ঐ সবুজটুকুর আবির্ভাবে চোখ দুটোও বেশ জুড়িয়ে যেত। মনের চোখ দিয়ে সেই দৃশ্য স্পষ্ট দেখতে পেলাম, মনের চোখ জুড়িয়ে গেল।

নিঃশ্বাসটা আর চাপতে পারলাম না। কোথায়ই বা সেই সরষে বাটা কোথাই বা ধনে শাক!

বললাম—মরুক গে যাক পারশে মাছ। কি জুটবে এখানে যে খাবে! ধনে পাতা কাঁচা লঙ্কা সরষে—নিদেন একটু সরষের তেল কিছুই নেই।—আছে তো শুধু এক ধ্যাবড়া ঘি। ওই দিয়ে পারশের জাত মারবে নাকি! যেতে দাও যেতে দাও—

বেশ একটু সময় চুপ করে থেকে ভৈরবী বললেন—পোড়া দিয়েও খাওয়া যায়। টাটকা মাছ, তেল চপ্‌চপ্‌ বানাবার চাটু রয়েছে সঙ্গে, তার ওপর কলাপাতা পেতে মাছগুলোকে বেশ করে—

আর সহ্য হল না। তেড়ে উঠলাম—কলাপাতা! তার চেয়ে একটা সোনার পাথর বাটি তুললে আরও ভাল হত। এই সাত সুমুদ্দুরের বুকে ভাসতে ভাসতে এক আজগুবি শখ। বেঁচে-বত্তে যদি কখনও ফিরতে পারি দেশে তখন ও সব শখ মেটানো যাবে।

এবার বেশ কিছুক্ষণ আর কিছু শুনতে পেলাম না। অবশেষে খুব চাপা খুব ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটি কথা কানে গেল—দেশ! ঘর! ফিরে যাব! কোথায় ফিরব!

চুপ মেরে গেলাম।

নৌকাখানা দুলছে, দুলছে বুকের ভেতরটাও। অতি সামান্য সাড়া-শব্দ হচ্ছে মাঝে মাঝে। অবোধ্য ভাষায় মাঝি-মাল্লারা এক একবার হাঁকাহাঁকি করে উঠছে। নৌকাখানার চার ধারে পালের দড়ি হাতে নিয়ে জেগে বসে আছে বার-তের জন মানুষ, একজন ধরে আছে হাল। যে যার নিজের কাজ করে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে হাঁকাহাঁকি করে নতুন রকমে পালগুলোকে ঘোরাচ্ছে। হাওয়ার মোড় ফিরল তো পালেরও একটু হেরফের হল। কোনওটা একটু ডান দিকে ফিরল, কোনওটা একটু নামল, কোনওটা বা কোণাকুণি ঘুরে গেল। হয়তো একখানা ফালতু তিনকোণা পাল লাফিয়ে উঠল একেবারে মাস্তুলের ডগায়, একখানা লম্বা ফালিকে একেবারে নামিয়ে নেওয়া হল। পালের নৌকা হাওয়ায় চলে, এইটেই জানা ছিল। সেই হাওয়াকে বাগ মানাতে অতগুলো মানুষকে ওত পেতে বসে থাকতে হয়, এটা ধারণায় ছিল না।

তার মানে—হাওয়ায় চলে না কিছুই। হাওয়ার মুখে শক্ত করে লাগাম কষে শক্ত হাতে সেই সেই লাগাম বাগিয়ে ধরে পালের নৌকা চালানো হয়। মানুষের হাত না লাগলে কোনও নৌকাই কোনও দিকে এতটুকু এগোয় না।

তার মানে—লাগাম কষে লাগাম হাতে নিয়ে বসে থাকবার জন্যই

মানুষের সৃষ্টি। সে লাগাম কখনও সময়ের মুখে লাগাচ্ছে, কখনও হাওয়ার মুখে লাগাচ্ছে, কখনও বা নিজের প্রবৃত্তিগুলোর মুখে কষছে। মোটের ওপর বিশ্বসংসারখানাকে ইচ্ছে মত চালাবার কায়দাটা হল লাগাম কষা। সেই কর্মটি যার দ্বারা হবে না, তার দুনিয়া তাকে পরোয়া না করে নিজের খেয়াল-খুশি মাফিক ছুটবে। থাকুক সে পেছনে পড়ে, দুনিয়ার বড় বয়েই গেল।

মজা হচ্ছে, এই রকমের দুনিয়াতেও একে অপরের সঙ্গে এক সঙ্গে টিকতে চায়, একজন অপর জনকে কিছুতে ছাড়তে চায় না, জীবন মরণ পণ করে এ ওর ঘাড়ে ছিনেজোঁকের মত লেগে থাকে।

কেন!

নিঃশব্দে উঠে বসলাম। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম, পান মুখে দেওয়া কর্মটি সুসম্পন্ন করে ভৈরবী কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়েছেন। পারশে মাছের শোকটা বেচারীর বড্ডই লেগেছে।

আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে বসলাম নৌকার পেছন দিকে। হাল ধরে যিনি বসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। কথায় কথায় তাঁর ঘর সংসারের কথা উঠে পড়ল, এই সাধাসিধে সুখ দুঃখের কাহিনী আর কি। কচ্ছের কূলে চাষ আবাদ হয় না গরু বাছুর পোষবার উপায় নেই, ব্যবসা বাণিজ্যের কথাই ওঠে না। ওই তল্লাটে যারা জন্মায়, তারা জন্মেই দেখে সমুদ্র। আর অমনি সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুরুষানুক্রমে এই আইন-ই চলছে। সমুদ্র ওদের পেট চালায়, ওদের বাঁচিয়ে রাখে। সমুদ্রের বুকে ঝড় তুফান ওঠে, সমুদ্র গর্জন করে, শিস দিয়ে ইশারা করে। সমুদ্রের সঙ্গে ওদের মিতালি। সমুদ্রের মেজাজ

বুঝে চলতে পারলে আর কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। নৌকা নিয়ে চলে যাও আফ্রিকার কূলে, সেখান থেকে আরও খানিক পশ্চিমে পাড়ি দাও। সেখান থেকে করাচী এস বা বোম্বাই গিয়ে পৌঁছে যাও। নয় তো মন চায়, ঘুরতে থাক মালাবারের তট ঘেঁসে। খেজুর নারকেল দড়ি শুঁটকীমাছ কাজুবাদামের বস্তা তেল ভরতি টিন চেটাই মোড়া গুড়, হল তো এক নৌকা বড় বড় রামছাগল বা মোষ, এমনি কি বেঁটে বেঁটে টাট্টু পর্যন্ত মিলে যেতে পারে। এঘাট থেকে তুলে ওঘাটে দাও পৌঁছে। ব্যাস্, একটি বছরের জন্যে নিশ্চিন্ত। নিজেদের কূলে ফিরে নৌকাখানাকে উলটে রেখে মৌজ মাফিক দিন গুজরান কর। মৌসুমে তো আর দরিয়ায় বেরোনো যায় না।

জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম—মর্জি, সবই হল দরিয়ার মর্জি। কোনও কোনও বছর মৌসুম আগিয়ে আসে, কোনও বছর পিছিয়ে যায়। মৌসুমের মর্জির সংবাদ বয়ে নিয়ে আসে এক জাতের পাখি। ইয়া বড় বড় পাখিগুলো দল বেঁধে উড়ে চলে আসে আফ্রিকা থেকে মৌসুমের আগে। সে বছর তখনও তারা আসে নি। তাই অনেকের নৌকা দরিয়ায় ভাসছে তখনও। তবে আর নয়, তাই করাচী থেকে মালের বদলে বালি ভরা হয়েছে নৌকায়। নিজেদের কূলে পৌঁছে বালি খালাস করে নৌকাখানা উলটে রাখা হবে। মাস তিনেক পরে নৌকা মেরামত করে তেল রঙ লাগিয়ে আবার চিত করা হবে।

খেয়ালে এসে গেল মাসের নামটা। ১৯৫৩ সালের ভাদ্র মাস। ভাদ্র মাস তো মহা-মৌসুম! ভাদ্দুরে বৃষ্টিতে এখন ওধারের পুব অঞ্চলটা পচে উঠেছে। কিন্তু এধারে যে বৃষ্টির নাম গন্ধ নেই। তা হলে মৌসুমটা এধারে শুরু হয় কখন!

যাক্, মাস তিনেকের জন্যে এরা নিশ্চিন্ত হবার আশায় ঘরে ফিরছে। সবায়েরই মন মেজাজ হালকা হয়ে রয়েছে। পালে যে হাওয়া লাগছে, তার চেয়ে অনেক গুণ জোর হাওয়া লেগেছে এদের মনের পালে। এরা সব ঘরে ফিরছে।

অনেকক্ষণ পরে তেল আর সরষের ব্যবস্থা করে সেখান থেকে উঠে এলাম। তেলটা চিনে বাদামের, সরষেগুলো সত্যিই সরষে। গত বছর একবার সরষের বস্তা বোঝাই হয়ে ছিল বোম্বাই থেকে, গিয়েছিল সে মাল আফ্রিকায়। ছিঁড়ে গিয়েছিল বস্তা কয়েকখানা, এক টিন মাল এরা ধরে রেখেছিল। জিনিসটা বাত-ব্যথার বড় আচ্ছা দাওয়াই, জল দিয়ে পিষে গরম করে ব্যথার জায়গায় খানিকটা লাগালে সঙ্গে সঙ্গে বিলকুল আরাম হয়ে যায়। তা সেই টিনটা এবারেও ওরা তুলে এনেছে। বলা তো যায় না, যদি কারও চোট-ফোট লাগে।

অতএব ওই দাওয়াই দিতে তাদের কোনও আপত্তি নেই।

ফিরে এসে কাঁথা মুড়ি দিলাম। করাচীতে যে কদিন ছিলাম, তার ভেতরেই আমার ছেঁড়া কাপড় চাদর কখানা দিয়ে ভৈরবী পাতলা পাতলা দুখানা কাঁথা বানিয়ে ফেলেছেন। নতুন কাপড় চাদর এক প্রস্থ শেঠজীরা দিলেন কিনা হিংলাজ থেকে ফিরতেই, তাই পুরনো-গুলোয় কাঁথা হয়ে গেল। ভারী আরাম, সত্যি ভারী আরাম পুরনো কাপড়ের পাতলা নরম কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুতে।

কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে মনে মনে হেসে নিলাম। সকালে যখন ঘুম ভাঙবে তখন জানতে পারবেন উনি যে দরিয়ার বুকেও সরষে জুটে গেছে। ধনে পাতা আর কাঁচা লঙ্কাটা জুটল না। তা আর কি হবে!

সংসার আমাদের সঙ্গে রয়েছে, ঘর বাড়ি ঘাড়ে নিয়ে ঘুরছি। তবে! তবে কেন মাঝে মাঝে আঁধার জমে ওঠে মনের কোণে!

ফিরব কেন! কোন গরজে ফিরব! ফিরলে কি আর ঢেউয়ের মাথায় চড়ে এ ভাবে দোল খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়া বরাতে ঘটবে!

ঘুমিয়েই পড়লাম। দরিয়া দোল দিতে লাগল।

॥ দুই ॥

প্রথম রাতটি খরচা হয়ে গেল।

ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে মগজের মধ্যে উদয় হল সহজ হিসেবটা, ছয় থেকে এক কমে গেল, হাতে রইল পাঁচ। হাতে নয়, নৌকায়। নৌকার গর্ভে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে আর মাত্র পাঁচটি রাত কাটানো যাবে। আর পাঁচটি রাত খরচা হলেই সমুদ্র হয়ে যাবে খতম।

মন চাইল না চোখ মেলে উঠে বসতে। চোখ বুজে পড়ে থাকলে ফাঁকি দিয়ে রাতটাকে খানিক টেনে লম্বা করা যাবে। ফাঁকিটুকুই কি কম লাভ নাকি!

সমুদ্রের বুকে সেই প্রথম ভোরটিকে ফাঁকি দিতে গেলাম। ফাঁকি দিতে গিয়ে খুব বড় একটা লাভ হয়ে গেল। শুনতে পেলাম একটা বিচিত্র সুর, সুর নয় ধ্বনি। ধ্বনিটা উঠছে কোথা থেকে!

জেগে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে বহু রাত কেটেছে নদীর বুকে নৌকায় শুয়ে। অবিশ্রান্ত একঘেয়ে শব্দ শুনেছি ছলাৎ ছলাৎ। সে আওয়াজ

পৌঁছেছে কান পর্যন্ত, বুকের মধ্যে ঢুকে সেখানে তোলপাড় লাগায় নি। আর এই যে আওয়াজটা শুনতে পেলাম, এটার উৎপত্তি নৌকার গায়ে তরঙ্গের আঘাত থেকে নয়। সমুদ্র নৌকার গায়ে আঘাত হানে না, নৌকাখানাকে নিয়ে লোফালুফি খেলে। সে খেলায় এতটুকু শব্দ হয় না। সাগরে যে শব্দ শোনা যায়, সেটা জলের নয়, জলতরঙ্গেরও নয়। সে হল অন্য ব্যাপার, নিজের বুকে কান পাতলেও ঐ জাতের শব্দ শোনা যায়।

সমুদ্রের বুকে প্রথম ভোর হল। জীবন-সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে সর্বপ্রথম ঘুম ভাঙল যেন। ঘুম ভাঙতেই শুনতে পেলাম এক বিচিত্র ধ্বনি। সে ধ্বনির সংকেতটুকু ধরবার চেষ্টা করতে লাগলাম চোখ বুজে শুয়ে। ফাঁকি দিতে গিয়ে মস্ত একটা ফায়দা হয়ে গেল।

সেই প্রথম বুঝতে পারলাম, নদীর সুরে আর সাগরের ধ্বনিতে কি দুস্তর ফারাক। নদীতেও জল, সমুদ্রেও জল, এ জল মিষ্টি ও জল লোনা। ডুবে মরার সুবিধে দুয়েতেই সমান। তবু নদীর জীবন আর সমুদ্রের প্রাণ এক নয়। নদীর জীবন সমুদ্রে গিয়ে ফুরিয়ে যায়, সমুদ্রের প্রাণ কিছুতে ফুরোয় না। সমুদ্র সকলের প্রাণ হরণ করতে পারে, সমুদ্রের প্রাণ কেউ নিতে পারে না।

সমুদ্রের প্রাণের স্পর্শ পেয়ে আচম্বিতে একটা ভুল ভেঙে গেল। সেই প্রথম বুঝতে পারলাম, প্রাণ কখনও নাশ হয় না। সমুদ্রের কূলে কূলে যেখানে যত প্রাণ আছে, সব প্রাণের ভাঁড়ার হল ঐ সমুদ্র। দুনিয়া সমুদ্র থেকে প্রাণ ধরে নেয়, আবার সমুদ্রেই সেই প্রাণ ফিরিয়ে দেয়। তাই সমুদ্রের প্রাণ কিছুতে ফুরোয় না, সমুদ্র

কখনও থেমে থাকতে পারে না। যেদিন সমুদ্র থেমে যাবে সেদিন দুনিয়ার দুনিয়াদারিও থাকবে না।

দুনিয়ার দুনিয়াদারি যে সমুদ্রের বুকেও সঙ্গ নিয়েছে, তা আগে টের পাই নি। সমুদ্রের প্রাণ নিয়ে মশগুল হয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকা বেশিক্ষণ পোষাল না। অত্যন্ত সন্নিকটে অতি সুমধুর একটি সম্ভাষণ শোনা গেল। সম্ভাষণটিকে পরিষ্কার বাঙলায় বললে দাঁড়ায় —মচ্ছিখোর বাঙালীটা এখনও শুয়ে রয়েছে। সাধু সেজেছে, লাল কাপড় পরেছে, জীবহত্যাটা তবু ছাড়তে পারে নি। ভণ্ডামি আর কাকে বলে!

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। চোখ মেলতেই চোখোচোখি হয়ে গেল শ্রীকৈকেয়ানন্দন মিশ্র মহাশয়ের সঙ্গে। দর্শনমাত্র চিনে ফেললাম, আমার মত উনিও পূবপ্রান্তের মানুষ। ওদিককার মানুষ না হলে মচ্ছিখোর বাঙালীকে অমন সম্ভাষণ কে করবে!

সম্ভাষণটি হজম করে সবিনয়ে নিবেদন করলাম আসন গ্রহণ করবার জন্যে। উনি সেটা গ্রাহ্যও করলেন না। ভয়ানক চড়া সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—

কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

বললাম যা বলার। হিংলাজ গিয়েছিলাম, হিংলাজ গেলে জাত যায়, তাই এখন কোটেশ্বর যাচ্ছি। কোটেশ্বর দর্শন করলে আবার জাতে উঠব।

ভদ্রলোক একেবারে হাঁ হয়ে গেলেন। মিনিটখানেক পরে তাঁর গলায় স্বর ফুটল। বললেন—হিংলাজ! সে তো সেই পাঠান-

মুলুকে ? সেখানে যেতে গেলে তো মানুষ মরে যায় শুনেছি। বেঁচে ফিরে এলে যে তোমরা !

বললাম—আজ্ঞে, বেঁচে আছি বলেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু জাতটা মরে গেছে। তাই এখন কোটেশ্বর চলেছি। কোটেশ্বর মহাদেব দর্শন করলে মরা জাতটা আবার বেঁচে উঠবে।

সে আবার কেমন করে-হবে ! ধপ করে বসে পড়লেন ভদ্রলোক। গোঁফে মোচড় দিতে দিতে মহাচিন্তিতভাবে বললেন—মরা জাত আবার বেঁচে উঠবে ! কি করে বাঁচবে ? যেখানে যাচ্ছ, সেখানে গিয়ে করবে কি তোমরা ?

আলাপ জমে উঠল। সেই প্রথম টের পেলাম, করাচী থেকে কচ্ছ্ নৌকাযাত্রায় আমাদের অনেকগুলি সহযাত্রী আছেন। পুরো একটা রাত কাবার হবার পর জানতে পারলাম যে নৌকায় আমরা ছুটি মাত্র যাত্রী নই। ছ টাকায় করাচী থেকে কচ্ছে পৌঁছোবার গরজ অনেকেরই আছে। শ্রীকৈকেয়ীনন্দন মিশ্র মহাশয়ও একজন সহযাত্রী। উনি কিন্তু তীর্থ করতে যাচ্ছেন না। যাচ্ছেন চাকরির খোঁজে। কচ্ছের মহারাজা তাঁর ট্যাটা প্রজাদের টিট করবার জন্যে বেছে বেছে মানুষ আমদানি করছেন। কৈকেয়ীনন্দন আসছেন কলকাতা থেকে। বাঙলাদেশের সব কটা জেলে চাকরি করেছেন তিনি, বিস্তর চোর ডাকু বদমাশ শায়েস্তা করতে করতে ও-ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি সরকারি চাকরির মেয়াদ ফুরিয়েছে, তাই নতুন চাকরির নেশায় ছুটেছেন।

তা করাচী হয়ে যাচ্ছেন কেন ? কলকাতা থেকে কাথীওয়াড় রেলে আসলেই পারতেন। কাথীওয়াড় থেকে সমুদ্র ডিঙোলেই হত।

হত বটে, কিন্তু গাঁটের কড়ি খরচা করে আসতে হত। হোরোস্টোন সাহেব চলে এলেন করাচীতে ইনস্‌পেক্টর জেনারেল হয়ে। তাঁর প্রথম শ্রেণীর সঙ্গে নফরদের জন্যে একখানা নফর-শ্রেণীও রিজার্ভ হয়ে এল। তাতে আশ্রয় নিয়ে একদম বিনা পয়সায় কৈকেয়ীনন্দন করাচী পৌঁছে গেলেন। সাহেব খুবই ভালবাসেন কিনা, তিনিই কচ্ছের মহারাজার কাছে কৈকেয়ীনন্দনের নামটি পাঠিয়েছিলেন। তাঁর দয়াতেই চাকরি হল, চাকরি-স্থলে পৌঁছোনও গেল তাঁর দয়ায়। হাঙ্গামা চুকে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম—চাকরিতে যোগ দেবার জন্যে আসার খরচাটা কচ্ছের মহারাজা পাঠান নি? নিজের খরচায় চাকরি করতে আসতে হল নাকি আপনাকে?

আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগল কৈকেয়ীনন্দনের। ফোঁস করে উঠলেন—খরচা না পাঠালে আসতাম নাকি আমি! সে বান্দা মিশির মহারাজা নয়। দেড় কুড়ি বছর সরকারি চাকরি করে আসছি। ওয়ার্ডার হয়ে ঢুকেছিলাম, বড় জমাদার হয়ে চাকরি শেষ করলাম। বলুক তো দেখি কে বলবে যে মিশির মহারাজ আটাশ বছরের মধ্যে একটিবার নিজের খরচায় রেলগাড়ি চড়েছে। বছরে দুবার বাড়ি গেছি, আসা-যাওয়ার খরচা সরকারের। সরকার টাকা পাঠাল তো ফের নকরিতে গিয়ে লাগলাম। নয় তো রইলাম বসে বাড়িতে, চালাক না দেখি কি করে চালায় জেলখানা। হুঁ হুঁ—চোর ডাকু বদমাশ থাকে জেলে, জেলখানা চালানো অত সহজ ব্যাপার নয়।

অতঃপর আর বলবার কিছুই রইল না। শ্রীকৈকেয়ীনন্দন মিশ্র মহাশয়, সংক্ষেপে মিশিরজী মহারাজ সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগলেন

তাঁর চাকরী-জীবনের কাহিনী। দু হাতে দুখানা তরোয়াল ঘুরিয়ে আটাশ বছর নকরি করতে হয়েছে তাঁকে। একদিকে যেমন বাঘা বাঘা বজ্জাত সাহেবগুলো, অন্যদিকে তেমনি হাড়-হারামজাদা বিচ্ছু বদমাশরা। এদের তুষ্ট করতে গেলে ওরা যায় বিগড়ে, ওদের তুষ্ট করতে গেলে এরা আসে টুঁটি কামড়াতে। সামলাতে হবে দু পক্ষকেই। তবেই-না জেলখানায় কোন হুজ্জত বাধবে না, পাগলা ঘন্টি পিটতে হবে না, মার-ধোর ডাণ্ডাবেড়ী মাড়ভাত কিছুই হবে না। জেলখানার খাতায় দিনের পর দিন লেখা হবে, কোনও গোলমাল হয় নি। বড় জমাদার ছোট জমাদার বড়বাবু ছোটবাবু সবায়ের চাকরির কদর বাড়বে।

তা কদর কৈকেয়ীনন্দনের ছিল। সাহেবদের কাছেও ছিল, জেল-ঘুঘুদের কাছেও ছিল। সব থেকে বেয়াড়া জেলখানায় পাঠানো হয়েছে কৈকেয়ীনন্দনকে, দুর্দান্ত কয়েদীদের দুদিনে জব্দ করে দিয়েছেন তিনি। তাও মারধোর করে নয়, শাস্তি দিয়ে নয়, স্রেফ পিঠে হাত বুলিয়ে। দেখে শুনে সবাই বলেছে, বড় জমাদার মিশিরজী জাদু জানে। মাসখানেক কোনও জেলখানায় থাকলেই জেলসুদ্ধু মানুষকে একদম ভেড়া বানিয়ে ছেড়ে দেয়।

ভারী ভক্তি বেড়ে গেল আমার। ঠিক করলাম, মিশিরজীর চেলা বনে যাব। চোর বদমাশ ডাকুদের ভেড়া বানাবার জাদুমন্ত্রটি যে ভাবে হোক আদায় করে নিতে হবে।

মন্ত্রটি তৎক্ষণাৎ দান করলেন মিশিরজী। বললেন—কিছুই নয় সাধু বাবা, মন্ত্র-তন্ত্র কিছু নয়। শুধু হজমী গুলি, দু গুলি খাইয়ে দিন, পেটের নাড়ী-ভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে যাবে। খিদের জ্বালায় তখন পায়ে ধরতে আসবে। যা হয় কিছু খেতে দাও, দিয়ে প্রাণটা অন্ততঃ

বাঁচাও। একদম কুকুর বনে গেল, তখন যা ইচ্ছে হুকুম কর, মুখ বুজে তালিম করবে।

গলাটা প্রায় বুজে এল আমার। মিনমিন করে বললাম—সেইগুলি কোথায় পেতেন আপনি মিশিরজী? তারাই বা খেত কেন সেই গুলি? অমন সব্বনেশে খিদে পায় যাতে তেমন ওযুধ খেত কেন তারা?

মিশিরজী একটি চুমকুড়ি দিয়ে বললেন—গুলিটা আমিই বানাতাম। আমার ঠাকুর্দা খুব নামজাদা বৈদ্য ছিলেন, তিনিই শিখিয়ে গেছেন আমায়। ডালে মেশাও তরকারিতে মেশাও, বেমালুম মিশে যাবে। একদম কোনও গন্ধ নেই, একটুও অন্য রকম আস্বাদ পাওয়া যাবে না। সেই ডাল তরকারি খাইয়ে দাও। দুদিনে জেলখানা সুদ্ধু লোক ঠাণ্ডা। খিদে খিদে আর খিদে। খিদের চোটে সবাই মরমর। মাপা খোরাক। হাজতীদের কম মাপ কয়েদীদের বেশী মাপ। সে মাপ তো আর কমানো বাড়ানো যায় না। পায়ে না পড়ে যাবে কোথায়?

সংকেতটি বাতলে মিশিরজী গলা কাঁপিয়ে হাসি জুড়ে দিলেন। স্তম্ভিত হয়ে তাঁর বিঘত-প্রমাণ গোঁফ জোড়াটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

গোঁফ রাখার উদ্দেশ্য বহু রকমের থাকতে পারে, সব থেকে উপাদেয় উদ্দেশ্য বোধ হয় মানুষকে ভয় দেখানো। গোঁফ ঠোঁটের ওপর গজায়, ওপরের ঠোঁট হল গোঁফের নিজস্ব এলাকা। সেই গোঁফ যদি দাড়ির ঘরে ঢুকে চিবুকের দুপাশ দিয়ে নেমে গিয়ে গলায় ঝুলতে থাকে, তা হলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়! মিশিরজী আবার গোঁফের দুই প্রান্তে দুটি গিঁট দিয়ে রাখতেন। সে দুটি ওঁর গলায় দুল-দুলিয়ে

তুলত। আসল আসুরিক আভিজাত্য, ঢাল একখানা বাগিয়ে ধরে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেই দিব্যি মা দুর্গার পায়ের তলায় মানিয়ে যায়।

ঐ গোঁফই বোধ হয় ঘাবড়ে দিয়েছিল ভৈরবীকে। উপস্থিত হলেন তিনি লেঠা একদম চুকিয়ে দিয়ে। মুখ চুন হয়ে গেছে, নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু জল দেখা দিয়েছে, গলাটা যেন কে টিপে ধরেছে। বললেন—তা হলে কি হবে?

বললাম—শুধু সরষে বাটা দিয়ে ঝাল-দেওয়া। ওদের শিল-নোড়া ধুয়ে নিও ভাল করে, নয় তো রসুনের গন্ধ বেরবে।

দীর্ঘ একটি শ্বাস ফেলে ভৈরবী বললেন—শুধু সরষে-বাটা দিয়ে ঝাল দেওয়া হবে কেমন করে? আসল জিনিস না হলে—

আর এগতে দিলাম না, বললাম—সরষে পাওয়া গেছে, এই কত ভাগ্যি। তেল মোটে লাগবেই না, চাপিয়ে দাও গে কাঁচা মাছ আর সরষে বাটা। হলুদ লঙ্কার গুঁড়ো তো ঝুলিতেই আছে। একটু ফুটলেই দেখবে, মাছের গা থেকে কত তেল বেরয়।

আবার মাছ! রক্ষে কর বাপু, সাগরের জিনিস, সাগরকে ফিরিয়ে দিয়েছি। আর একটি আরও লম্বা শ্বাস ফেলে দু হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন ভৈরবী, চোখ বুজে ঠোঁট নাড়তে লাগলেন।

মৌন প্রার্থনা, সম্ভবতঃ সাগরের কাছেই প্রার্থনা জানাতে লাগলেন তিনি। অপরাধ করে ফেলেছেন, অপরাধটার জন্যে ক্ষমা চান। সাগর জীবকে ধরে সাগরের বুকে জবাই করার দরুন সাগর যদি প্রতিশোধ নিতে চায়।

অসম্ভব নয়। সাগর মরে নেই, সাগর হয়তো যা-তা কাণ্ড করে ফেলবে।

সাগর হল প্রাণের আধার, সাগর কখনও ঘুমিয়ে পড়ে না, সাগর হয়তো ক্ষমা করতেও জানে না। আহা—জননী ধরিত্রী যদি সাগরের মত হত! সবই মুখ বুজে সহ্য করেন জননী। তা যদি না করতেন, তা হলে কি জেলখানার কয়েদীদের হজমিগুলি খাইয়ে খিদের জ্বালায় তাদের ছটফট করতে দেখে মনের আনন্দে সাহেব প্রভুর কাছে বাহবা নিতে সাহস করত কেউ! ঐ জাতের কাণ্ডকারখানা অনবরত ঘটছে ধরিত্রীর বুকে, ধরিত্রী কিন্তু টলছেন না, ধরিত্রীর বুকে দোলা লাগছে না, ধরিত্রী যেন মরে আছেন। মরা ধরিত্রীখানাকে স্মরণ করে দাঁতে দাঁত চেপে মিশিরজীর গোঁফ জোড়াটার পানে তাকালাম।

মিশিরজী বাংলা বুঝতে পারেন। মাছ ফেলে দিয়েছেন ভৈরবী জানতে পেরে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন—খুব ভাল কাজ করেছেন মাতাজী, শ্রীরাম চন্দর ভগবানজী রক্ষা করবেন। তিনি সাগর-বন্ধন করেছিলেন, তাঁর কৃপায় আমরা নির্বিঘ্নে সাগর ডিঙিয়ে যাব।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি সাঁতার জানেন মিশিরজী?

মিশিরজী বললেন—সাঁতার! রাম রাম, ও কাজ শিখতে হলে মচ্ছি খেতে হয়। সাঁতার শিখে লাভ কি হবে বলুন? ভগবান রামচন্দরজী কি সাঁতার কেটে সাগর ডিঙিয়ে গিয়েছিলেন লঙ্কায়? সেতুবন্ধন করতে পারলে জলে নামতে হবে কেন?

আর কিছু বললাম না। কৈকেয়ীনন্দন উঠে গেলেন। বলে গেলেন, আবার এসে গল্প-সল্প করবেন।

শুয়ে পড়লাম। করবার নেই কিছুই, শুয়ে থাকা ছাড়া কোনও কর্ম হাতে নেই। একটা কাজ করছি বটে, কাজটার নাম গমন। হিংলাজ

দর্শন করে কোটেশ্বর দর্শনে চলেছি। সেই যাওয়া কর্মটিও 'আপ্‌সে-আপ্‌' সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছি বটে, কিন্তু যাওয়া কর্মটির সঙ্গে কোনওখানে কিছু মাত্র সম্পর্ক আছে নিজের তা যেন বুঝতেই পারছি না। একেবারে নিরম্বু অবকাশ যাকে বলে, এমন অবকাশ মরবার আগে পাওয়া যায়, তা মোটে জানতামই না।

এখান থেকে ওখানে আর ওখান থেকে সেখানে বহুবার বহু রকমের কাজে অকাজে গেছি এসেছি, বহু বিচিত্র যানবাহনেও চড়তে হয়েছে। পৌঁছোবার দায়টা যানবাহনের ওপর ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত নিষ্ঠায় নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করে বসে শুয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি, তবু যেন গমন কর্মটির সঙ্গে কোথায় একটু সম্পর্ক থেকে গেছে, দুনিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধটা একেবারে ষোল আনা ঘুচে যায় নি। রেলগাড়ির জানলার বাইরে নজর ফেলে কত কি ধরে ফেলেছি মনের ক্যামেরায়। নৌকায় চেপে নদীর দু কূলে তাকিয়ে মন উধাও হয়ে গেছে। গাঁয়ের ঝিয়ারী জলকে এসে সমবয়সী বহুড়ীটির কানে কানে কি যেন বলছে নৌকা পানে তাকিয়ে। পরম ধার্মিক বক এক পায়ে দাঁড়িয়ে কঠোর সাধনা করছে—'মচ্ছিসাধনা'। রাঘব-বোয়াল হঠাৎ ঘাই মেরে বিশাল এক হাই তুলে আবার চলে যাচ্ছে জলের তলায় তার বিছানায় শুয়ে ঘুমুতে। উড়ন্ত মাছরাঙাটি কি যেন এক গোপন বার্তা শুনিয়ে গেল নদীর কানে নিমেষের মধ্যে। জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে জীবনের উৎসব। নদীতে নৌকায় চেপে বা রেলগাড়িতে আসীন হয়ে ঘোরা ফেরা করলে জীবনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

সমুদ্র কিন্তু ফাঁকির রাজত্ব। কোথাও কিছু নেই যার পেছনে মনকে ধাওয়া করানো যায়। নেই ব্যাপারটা যে কি সাংঘাতিক রকম

কিছু না থাকা, তা মর্মে মর্মে আনা যায় নৌকায় চেপে সমুদ্রের বুকে ভাসলে। আকাশের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আকাশের মনের কথা বেশ টের পাওয়া যায় যেন। বাক্যবিহীন ভাষায় শূন্য আকাশ শোনায়—যাবেই বা কোথায় আসলেই বা কোথা থেকে? আমার এলাকা ছাড়িয়ে কোথায় পালাবে তুমি? যাওয়া আসা দুটি কর্মই মন-গড়া মিথ্যে, একেবারে কথার কথা। তাকিয়ে দেখ কোথায় আমি নেই।

সমুদ্রের বুকে নৌকায় শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটে যায়। কিছুক্ষণ পরে কিছুই থাকে না। সারা মনটা জুড়ে থাকে আকাশ, শুধু আকাশ। আকাশে একটা কাক চিল পর্যন্ত থাকে না। অবশেষে মনটাই আকাশের মত সীমাহীন হয়ে পড়ে। সেই মনে তখন এতটুকু দাগ পড়ে না। এমন কি আমার মনে আমিটি পর্যন্ত হারিয়ে যায়। ডাঙ্গার আকাশ মরীচিকা সৃষ্টি করে, সমুদ্রের আকাশ মনকে গ্রাস করে ফেলে। সেই মনে তখন অনন্ত-শয়নের ব্যাখ্যাটি চমৎকার ভাবে ফুটে ওঠে। ভেলায় শুয়ে সমুদ্রে ভাসার নামই অনন্ত-শয়ন, অনন্ত-শয়নে শুয়ে কোনও কর্মের সঙ্গে-ই সংশ্রব রাখা সম্ভব হয় না। তখন অনন্ত-শয়নের আসল তাৎপর্যটি হৃদয়ঙ্গম হয়।

অনন্ত-শয়নের ব্যাখ্যাটি শোনালেন ভাই পরমানন্দজী। উনিও চলেছেন কচ্ছে। ভদ্রলোক বললে অন্যায় হয় না তাঁকে। দুধের মত সাদা জামা কাপড় পরে আছেন, চুলগুলিও দুধের মত সাদা! গোঁফ দাড়ি একদম নেই। সেধে এসে আলাপ করলেন, তন্ত্রমন্ত্র সম্বন্ধে জানতে চান কিছু। উনিও দেবীর সেবায়েত, কচ্ছের মহারাজার

ইষ্টদেবী হলেন আশাপূর্ণা। আশাপূর্ণার সেবায় সাত পুরুষ ধরে নিযুক্ত আছেন পরমানন্দজীরা। উনি দেহত্যাগ করলে ওঁর পুত্র ভূমানন্দজী সেবায়েত হবেন।

বাপ বেটা দুজনেই আনন্দ! ওঁরাও কি সাধু সন্ন্যাসী নাকি।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার পিতার নাম কি ছিল পরমানন্দজী?

দেবানন্দজী, পিতামহের নাম ছিল অদ্বৈতানন্দজী। আমাদের উপাধিই হল আনন্দ। উপাধিটাকে নামের সঙ্গে জুড়ে আমরাও আপনাদের মত সাধু হয়ে গেছি। জবাবটি দিয়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন।

ঐ নিঃশব্দ হাসিটিই হল পরমানন্দজীর পরম সম্পদ। হাসলে মুখের ওপর একটু কোঁচ পড়ে না, দাঁত দেখা যায় না, একটুও শব্দ হয় না। হাসিটা ঠিক আলোর মত ওঁর চোখ দুটিতে ফুটে ওঠে। সদ্য ঘুম-ভাঙা চাউনি পরমানন্দজীর, সেই চাউনি দিয়ে তিনি হাসতে পারেন। সে হাসির দিকে তাকালেও মনটা জুড়িয়ে যায়।

ভৈরবীর সঙ্গেই তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। মাছগুলো ফেলে দিতে উনি বারণ করেছিলেন। উচ্চাঙ্গের কথা বলেছিলেন ভৈরবীকে। বলেছিলেন, শ্বাসে-প্রশ্বাসে বিস্তর জীব ধ্বংস হচ্ছে, সুতরাং জীবহত্যায় পাপ নেই।

ঐ জীবহত্যা থেকেই অনন্ত-শয়ন এসে গেল। জানতে চাইলাম—সত্যিই আপনি বিশ্বাস করেন যে জীব-হত্যায় পাপ নেই? আমার ধারণা, জীব-হত্যার তুল্য মহাপাপ আর নেই পৃথিবীতে। শাস্ত্রে বলেছে—

পরমানন্দজী বললেন—শাস্ত্র যা বলেছে, তা আওড়ে লাভ কি।

বেঁচে থাকলেই জীবহত্যা করতে হবে। হচ্ছেও তাই, জলের সঙ্গে হাওয়ার সঙ্গে লক্ষ কোটি জীবকে আমরা ধ্বংস করছি। জীবহত্যাটা বন্ধ হবে, যেদিন জীব আর জন্মাবে না, ভগবান বিষ্ণু যেদিন সকল জীবের সমস্ত কর্মফলটুকু নিয়ে অনন্তশয্যা রচনা করে তার ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে থাকবেন। জীবহত্যা থেকেই এই মেদিনীটা তৈরী হয়েছে যে, মেদ থেকে মেদিনী। মধুকৈটভকে হত্যা না করলে এত মেদ পাওয়া যেত কোথায়।

মোক্ষম যুক্তি, তর্কাতীত প্রমাণ-প্রয়োগ। চুপ করে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। জীবহত্যার স্বপক্ষে মধুকৈটভকে আমদানি করলে আর কি বলা যায়! মধুকৈটভ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করার ধৃষ্টতা দেখিয়ে লাভ কি!

পরমানন্দজী কি জানি কি করে আন্দাজ করে নিলেন আমার ভাবটা। তাঁর সেই অত্যাশ্চর্য চোখ দুটির হাসির আলোয় দেখতে পেলেন বোধ হয় আমার মনের অন্ধকারটা। আরও একটু সময় নিঃশব্দে হেসে বললেন—সবই গাঁজাখুরি বলতে চান তো? স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক। যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে, ওর মধ্যে কি সংকেত লুকিয়ে আছে, ততক্ষণ সবই গাঁজাখুরি মনে হবে। মজা কি জানেন সাধুজী, যাতে সবই গাঁজাখুরি বলে মনে হয় তাই ইচ্ছে করে সমস্ত ব্যাপারটাকে ঐ ভাবে ঢেকে ঢুকে দেওয়া হয়েছে। সর্বনাশ হয়ে যেত যে অস্ত্র তৈরী করার সংকেত লুকনো আছে ঐ অনন্তশয়ন ব্যাপারটির মধ্যে সেটি যদি জানতে পারতাম আমরা তা হলে সৃষ্টিটাকে কবে ধ্বংস করে ছাড়তাম।

মুহূর্তমধ্যে চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। সৃষ্টিটাকে ধ্বংস করে ফেলার

এত বড় মওকা কে ছাড়ে ! খুবই চাপা গলায় একান্ত ঘনিষ্ঠতার সুরে জিজ্ঞাসা করলাম—সংকেত ! কিসের মধ্যে কি সংকেত লুকিয়ে আছে পরমানন্দজী ? বলুন চট করে। দেশের জাতির সমাজের ধর্মের এই যে অসহনীয় হীন অবস্থা, এ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে যদি—

পরমানন্দজী পরম ঔদার্যের সঙ্গে বললেন—সেই অস্ত্র বানিয়ে প্রয়োগ করতে পারবেন না। একশ আধশ বছরের পরমায়ু নিয়ে এসে সে অস্ত্র বানানো সম্ভব নয়। হাজার হাজার বছর যাঁরা বাঁচতেন, হাজার বছর ধরে যাঁরা তপস্যা করতে পারতেন সেই মুনি-ঋষিরা জানতে পেরেছিলেন সৃষ্টির রহস্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ মানুষ, মানুষ নিজের ভেতর অনুসন্ধান করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানতে পেরেছিল, নিজেকে ধ্বংস করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করার শক্তি অর্জন করেছিল। সে শক্তি আপনি-আমি পাব কেমন করে !

আর কিছু বলার রইল না। অত্যন্ত সমীহ সম্পন্ন হয়ে শুধু শুনে গেলাম। পরমানন্দজী মুনি-ঋষিদের চালাকির ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

সেই মুনি-ঋষিদের আমলে নাকি মানুষ দু দশ বিশ হাজার বছর বাঁচত। বাঁচত বলে দু দশ বিশ হাজার বছর তপস্যা করতে পারত। তপস্যা শব্দটার অর্থ হল, কোনও কিছু না পড়ে কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে যা কিছু জানার সব নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে জেনে ফেলা। পন্থাটা মোটেই শক্ত নয়, তবে সময়টা একটু বেশী লাগে। হাজার দশেক বছর চেষ্টা করা দরকার মন নামক বস্তুটিকে বাগাবার জন্যে। মনকে একবার বাগাতে পারলে সেই মনের কাছ থেকে ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই জেনে ফেলা যায়।

তা সেই মুনি-ঋষিরা তাঁদের মনকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছিলেন যে আমাদের আমলে আমরা মাত্র শতখানেক বছর বেঁচে থাকব। শতখানেক বছর পরমায়ুওয়ালা আমরা পৃথিবীর বুকে পদার্পণ করেই পৃথিবীটাকে চেটেপুটে খেয়ে ফেলতে চাইব। না থাকবে আমাদের সংযম, না থাকবে আমাদের হিতাহিত জ্ঞান। মেয়াদ অল্প যে, অল্প মেয়াদের ভেতর জগৎটাকে যতদূর সম্ভব ভোগ-উপভোগ করে যাওয়া চাই। সেইটেই হবে আমাদের একমাত্র জীবন-দর্শন। সুতরাং তাঁরা সৃষ্টির উৎপত্তি এবং সৃষ্টির নাশ এই দুটো সত্যকেই চালাকি করে ঘুরিয়ে বলে গেছেন। ঐ চণ্ডী, চণ্ডীর আসল ব্যাখ্যা যদি কেউ জানতে পারে, তা হলে ঘরে বসে একটিও কলকব্জা না নেড়ে অণু-পরমাণু ভেঙে মহাঅনর্থ কাণ্ড বাধিয়ে বসতে পারে। চক্ষের নিমেষে মহাপ্রলয় ঘটানো তার পক্ষে মোটেই বিচিত্র ব্যাপার নয়। তবে সময় চাই. দার্ঘ সময় চাই, হাজার হাজার বছর লেগে যাবে চণ্ডীর ব্যবস্থাপত্র-মাফিক সেই মহাস্ত্র বানাতে। সুতরাং চণ্ডীর আসল ব্যাখ্যা জেনেই বা লাভ কি!

লাভ হোক চাই লোকসান হোক তবু জানতে হবে ব্যাপারটা। ভয়ানক পেড়াপীড়ি জুড়ে দিলাম। অবশেষে পরমানন্দজী খানিকটা খোলসা করে বললেন। বললেন ঐ অনন্তশয়নের অন্তর্নিহিত অর্থ টুকু। যে ভাবে ব্যাখ্যা করলেন, সেটা সঠিক বজায় থাকবে না হয়তো। মাঝখানে এক ডজনেরও বেশী বছর কাবার হয়ে গেল কিনা। তবু চেষ্টা করছি, যদি কারও প্রয়োজনে লাগে, চণ্ডীর ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী আণবিক পারমাণবিক মহাস্ত্র বানাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যেতে পারেন।

পরমানন্দজীর মতে ক্ষীরসমুদ্র হল ক্যালসিয়ামের ক্যালসিয়ামত্ব-টুকু। ক্ষীরে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম বর্তমান, এটা যে কোনও বিজ্ঞানের ছাত্র জানেন। সেই ক্যালসিয়ামের শক্তির ওপর রয়েছে নাগ। মানে সীসে। সীসে হল এমন জিনিস যার মধ্যে রয়েছে মারাত্মক বিষ। আবার সমস্ত ধাতুর অন্তিম দশা হল সীসে। সোনা থেকে সোনাত্বটুকু নিংড়ে নাও যা পড়ে থাকবে তা হল সীসে। রুপো লোহা তামা টিন সব ধাতুরই শেষ অবস্থা নাকি সীসে। সেই সীসের যে শক্তি বা তেজ তা পড়ল ক্যালসিয়ামের তেজের ওপর। সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে রয়েছেন বিষ্ণু। বিষ্ণু হলেন হিরন্ময় পুরুষ। অর্থাৎ সোনার যে সুবর্ণ শক্তি তা পড়ল ক্যালসিয়াম আর সীসের শক্তির ওপর। তখন তৈরী হল নাভিকমল। ওটি হল রুপোর তেজ। রুপো থেকে নিঙড়ে বার করলে যে মহাশক্তি উৎপন্ন হবে, তাও থাকবে ঘুমিয়ে। সর্বশেষে তার ওপর বসবেন ব্রহ্মা। বসলেই যোগনিদ্রা ভঙ্গ হবে সুবর্ণের। ফলে মহামায়া যোগনিদ্রার মহাশক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে সুবর্ণশক্তি মধুকৈটভ বধ করবে, মেদিনী সৃষ্টি হবে।

জলের মত তরল ব্যাপারটা, না বোঝার কোনও কারণই নেই। কিন্তু ঐ ব্রহ্মাটি কে! যিনি রুপোর রুপোত্বের ওপর আসীন হলেই সুবর্ণের যোগনিদ্রা ভঙ্গ হবে।

পরমানন্দজী খুবই গলা খাটো করে বললেন—ব্রহ্মা হল পারদ। পারদ কি বস্তু জানেন সাধুজী? পারদ হল শিব-বীর্য, যা থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়েছে। পারদের ঘুম যে ভাঙাতে পারে, তার কাছে স্বর্গ-মর্ত-রসাতল কিছুই নয়। ইচ্ছে করলে সে আর একটা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে নিতে পারে।

চুপ করে ভাবতে লাগলাম আর একটা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করা উচিত হবে কি না। যেটা বর্তমান রয়েছে, সেটাকে নিয়েই তার সৃষ্টিকর্তা যে ভাবে হিমশিম খেয়ে মরছেন, তাতে আর একটা ঐ পদার্থ বানাতে বেশী ভরসা পেলাম না। এগোব কি পেছোব, ধাঁধায় পড়ে গেলাম।

ধাঁধা থেকে উদ্ধার করলেন নৌকার কাপ্তেন সাহেব এসে। অতীব মনোরম সংবাদ নিয়ে এসেছেন তিনি। পারশে মাছ যথাবিহিত শাস্ত্রসম্মত ভাবে রান্না হয়ে গেছে। নৌকা-সুদ্ধ দাঁড়ী মাঝীদের একান্ত বাসনা যে আমরা দুজন সেই মৎস্য সেবা করি। দোষও নেই তাতে, কোটেশ্বর দর্শন যখন করবই আমরা, তখন মরা জাতটা তো জ্যান্ত হবেই। এই ফাঁকে মরা জাতকে আর একবার মারলে বিশেষ ক্ষতি হবে না। সুতরাং অবিলম্বে স্নান করে প্রস্তুত হওয়া চাই।

পরমানন্দজীকেই শুধোলাম—কি বলেন আপনি? এদের অনুরোধটা না রাখা কি ভাল হবে?

পরমানন্দজী সজোরে মাথা নাড়িয়ে বললেন—না না, অমন কর্মই করবেন না। যা বলছে, মুখ বুজে পালন করুন। দরিয়ার বুকে দাঁড়ী-মাঝীদের সঙ্গে মন কষাকষি করতে আছে কখনও! দেখুন না, ঐ গুঁফো বজ্জাতটার কি হাল করে এরা। মাতাজীকে গালমন্দ করে এল লোকটা, এরা সবাই শুনলে। কিছু বললে না। কি জানি কি দশা ঘটে ব্যাটার!

## ॥ তিন ॥

দুপুরের রঙ্‌ও দিলদরিয়া। রঙ্‌ মানে—মেজাজ। মনে বেশ রঙ্‌ ধরেছে বললে বোঝায়, মেজাজটি বেশ তৈরী হয়ে উঠেছে। সে মেজাজের গায়ে ফুঁ লাগলে ফোস্কা পড়বার ভয় নেই। দুনিয়ার দিন তিন বার ভোল পালটায়—সকাল দুপুর বিকেল। সকালের মেজাজ দুপুরে থাকে না, দুপুরের মেজাজ বিকেলে বুড়ো হয়ে যায়। দরিয়ায় কিন্তু দুপুর নেই। দরিয়ায় সকাল হয়, সকালটা বজায় থাকতে থাকতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। সকাল-সন্ধ্যের মাঝখানটা একদম এক ভাবে থাকে। যেন একটা মস্ত দরবার বসেছে। আমীর ওমরাহ পরিবৃত মহামান্য বাদশা গুরুতর শলা-পরামর্শ চালাচ্ছেন। এই যুদ্ধ বিগ্রহ সন্ধি-মৈত্রী এই সব কুচক্কুরে ব্যাপার নিয়ে। দরবারী আদব কায়দা একটুও পালটাল না, কখন দুপুর হল কখন বিকেল এল, কেউ বুঝতেই পারল না। সকালের দিলদরিয়া মেজাজ সন্ধ্যে পর্যন্ত সমানে বজায় রইল। দিনটা ফুরিয়ে গেল।

দরিয়ার বুকে আস্ত একটা দিন কাবার হয়ে এল। হাই তুলতে হল না, ঢুলতে হল না বা তিরিক্ষি নয়নে 'দুত্তোর' বলে কপাল কোঁচকাতে হল না। এখান থেকে ওখানে আর ওখান থেকে সেখানে বসে দাঁড়িয়ে ঢেউ গুণে গুণে সময়টা কাটিয়ে দিলাম। একটি বারের জন্যে একঘেয়েমি ভূতে ঘাড় ছুঁতে পেল না।

ঢেউ গোনবার কায়দাটা বেশ রপ্ত হয়ে এল। বাঁ দিকে মুখ ঘুরিয়ে অনেক দূরের একটা ঢেউকে তাক করে নজরবন্দি করে ফেললাম।

ঢেউটা ওঠা নামা করতে করতে এগিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে মুখটাও ঘুরতে লাগল। এসে গেল নৌকার পাশে, চল্‌তে লাগল ডান দিকে। মুখও ঘুরতে লাগল ডান পাশে একটু একটু করে। দূরে আরও দূরে, একদম অনেকটা তফাতে পেঁীছে ঢেউটা তার দলের সঙ্গে ভিড়ে গেল। চেন তখন কি করে চিনবে। ভারী মজার খেলা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই খেলায় মেতে কাটিয়ে দেওয়া যায়। উত্তেজনাও হয় খুব। কোন ঢেউটাকে কতক্ষণ নজরের ফাঁদে আটকে রাখা যায়, এই একটি মাত্র চিন্তা ছাড়া মনে আর কোনও চিন্তার উদয় হয় না।

এই খেলার আর একটা নামই বোধ হয় জপ করা। মন্ত্র, মনকে ত্রাণ করা যায় যা দিয়ে তার নাম মন্ত্র। মন কথাটি উচ্চারণ করে যে জিনিসটিকে বোঝাতে চাই, সেটি যে কি বস্তু তা নিজেই জানি না। কোথায় থাকে মনটি, কি অবস্থায় থাকে, তাও বুঝি না। মাঝে মাঝে মালুম হয় যে সেই মন খারাপ হচ্ছে, কখনও ভাল হচ্ছে। কিসে ভাল হয়, কিসে খারাপ হয়, তাও বুঝি। শেষ পর্যন্ত এটাও টের পাই যে মন বাবাজী সদাসর্বক্ষণ কোনও না কোন ব্যাপারের পেছনে ধাওয়া করছে। সেই মনকে পাকড়াও করে উদ্ধার করতে হবে। ফ্যাসাদ আর কাকে বলে।

অতএব আগে পাকড়াও করবার চেষ্টা কর মনটিকে। লাগাও মন বাবাজীকে নির্দিষ্ট একটা কাজে। ঐ কাজটাই হল মন্ত্র জপ করা—সমুদ্রের ঢেউ গোনা। মন সমুদ্রে ঢেউ উঠছেই, একটার পেছনে একটা এগিয়ে আসছে সামনে, পার হয়ে চলে যাচ্ছে অপর দিকে। নজর রাখতে হবে, একটা ঢেউকে শক্ত করে নজরবন্দি করে রাখতে হবে।

সেটা যেই হারিয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে আর একটাকে ধরতে হবে। এক মুহূর্তের জন্যেও মন-বাবাজী যেন ফুরসত না পায়।

মুশকিল হচ্ছে, হাজার জাতের উপদ্রব আছে ডাঙ্গায়। আকাশ বাতাস ফল ফুল আলো আঁধার পশু পক্ষী মানুষ মেয়েমানুষ হাঁ করে আছে ডাঙ্গার ওপর। একটি বার ফাঁক পেলেই হয়, অমনি খপ করে মনটিকে কামড়ে ধরবে। দরিয়ার বুকে সে ভয় নেই। সেখানে আছে শুধু ঢেউ, অর্থহীন অফুরন্ত ঢেউ। সেই ঢেউয়ের সঙ্গে মন-সমুদ্রের ঢেউগুলোকে মিশিয়ে দাও। যতক্ষণ খুশি, যেমন ভাবে খুশি, গুনে চল। বাগ না মেনে মন বাবাজী যাবে কোথায়!

নৌকাখানাই বা কোথায় যাবে যতক্ষণ জম্‌শেদ সাহেব হালে বসে আছেন। উনিই নৌকাখানাকে বাগ মানান। নৌকার লেজের ডগায় দু হাত লম্বা দেড় হাত চওড়া একখানি কাঠ সাঁটা আছে। তার ওপর বসে আছেন জম্‌শেদ সাহেব। নজর করে দেখলে বোঝা যায়, হালের মাথাটা তাঁর বগলের মধ্যে রয়েছে। হাত দিয়ে হালখানাকে ঘোরাচ্ছেন ফেরাচ্ছেন না তিনি, নিজে এক আধ বার একটু আধটু এদিক ওদিক হেলে পড়ছেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজ হচ্ছে, উঠতি একটা ঢেউকে একটু ঠেলা দিয়ে নৌকা তার নিজের পথে এগিয়ে চলেছে। সময় নেই কিনা, দাঁড়িয়ে কোনও ঢেউয়ের সঙ্গে দু দণ্ড আলাপ করবার সময় কই নৌকার, ওধারে যে পাওয়ার তাড়া রয়েছে।

জম্‌শেদ সাহেবের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। জানতে চাইলাম পথ চিনছ কি করে? ডাইনে বাঁয়ে আকাশে জলে কোথায় কি আছে যা দেখে নৌকার মুখ ঘোরাচ্ছ?

জবাব পেলাম, পথ চেনাটা তাঁর কাজ নয়। সে কাজ কাপ্তেনের, যিনি মাচার তলায় মাতুর বিছিয়ে শুয়ে বজ্র-নির্ঘোষে নাক ডাকাচ্ছেন। নৌকা যদি ভুল পথে চলে তা হলে তাঁর ঘুম ভেঙে যাবে।

নাও কথা! নৌকার হাল ধরে আছে যে সে নৌকাকে ঠিক পথে পরিচালিত করছে না! তা হলে হাল ধরে থাকা কথাটার অর্থ কি!

জম্‌শেদ বললেন—হাল ধরে আছি ঐ পাজী ঢেউগুলোর জন্যে। হাওয়া যে দিকে বইছে, তার সঙ্গে হিসেব করে পাল তোলা হয়েছে। যতক্ষণ এই হাওয়া বজায় থাকবে ততক্ষণ কোনও ভাবনা নেই, নৌকা ঠিক পথে চলবে। কিন্তু ঐ বেইমান ঢেউগুলোকে বিশ্বাস নেই। যদি ঢিলে হাতে হাল ধরা হয়, তা হলে ঐ ঢেউগুলো ঠেলতে ঠেলতে নৌকাকে বিশ মাইল তফাতে নিয়ে ফেলবে। তাই খুবই হুঁশিয়ার থাকতে হয় হালে, হুঁশিয়ার হয়ে ঢেউগুলোকে শায়েস্তা করতে হয়।

বলে সাহেব এক গাছা দড়ি দেখালেন। প্রকাণ্ড একখানা পালের এক কোণের সঙ্গে বাঁধা আছে দড়ির এক মাথা, আর এক মাথা বাঁধা রয়েছে একটা লোহার কড়ায়। সেটা গাঁথা রয়েছে জম্‌শেদের ডান পাশে নৌকার পাড়ের সঙ্গে। জম্‌শেদ বললেন—যতক্ষণ এই দড়িটা টান টান থাকবে ততক্ষণ নৌকা ঠিক পথে চলছে বুঝতে হবে। এই দড়িটা ঢিলে হলেই হালকে একটু এধার ওধার ঘোরাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে দড়িতে আবার টান পড়বে। তার মানে ঐ পালখানায় ঠিক ঠাক হাওয়া ধরবে আর নৌকা ঠিক পথে এগিয়ে যাবে। দেখবে? এই দেখ—'

জম্‌শেদ হেলে পড়লেন বাঁ দিকে, তাঁর বগলে আটকানো হালখানাও খানিক হেলল। মিনিট খানেকও লাগল না, কড়াতে বাঁধা

দড়িটা ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়ল। মুখ তুলে দেখি, পেট-মোটা পালখানা চুপসে যাচ্ছে। নৌকার অন্য ধার থেকে কয়েক জন এক সঙ্গে ধমক দিয়ে উঠল। জম্‌শেদ আবার ডান ধারে হেললেন, একটা ধাক্কা লাগল নৌকার গায়ে, দড়িটা আবার টানটান হয়ে গেল। পালের পেট যথাযথ ফুলে উঠেছে।

ধাঁধা—সবটাই একটা জট পাকানো ব্যাপার। অতগুলো দড়ি কোনটে কখন টানতে হবে, কোনটেকে দিতে হবে ঢিলে ; অতগুলো পাল, কোনটের কি নাম, কে উঠবে, কে নামবে, সব একটা ব্যাকরণ-বদ্ধ ব্যাপার। অনুস্বর বিসর্গ পতন হলেই লাগল হুজ্জত। পণ্ডিত-মশায় জেগে উঠে রেগে টঙ্‌ হয়ে বেত হাতে তেড়ে আসবেন।

জম্‌শেদও তাই বললেন। অকপট সম্ভ্রমের সঙ্গে গল্প করতে লাগল কাপ্তেনের। ঐ যে মানুষটি প্রচুর ভোজন করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে নৌকার খোলের মধ্যে, ওর ওই ঘুমটা ঠিক ঘুম নয়। ওটা হল এক জাতের নেশা। দরিয়ার হাওয়া নাক দিয়ে টানলে ওর নেশা চড়ে যায়। হাওয়ার যদি একটু হেরফের হল তো অমনি ওর নেশা ছুটে গেল। দিনে রাতে যখনই হোক, আকাশে বাতাসে কোথাও কোনও ষড়যন্ত্র হয়েছে কি ওই মানুষটি খুব গরম হয়ে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসবে লড়তে। লড়াইতে না জিতে ওঁর হাত থেকে কিছুতে নৌকা কেড়ে নিতে পারবে না!

নৌকা কেড়ে নেবে! কারা নেবে? বোম্বেটেরা নাকি?—দম আটকে এল আমার। জম্‌শেদ তাঁর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দাড়ির জঙ্গলে হাত চালিয়ে বললেন—বোম্বেটেদের বাবা এই দরিয়া। ভয়ঙ্কর খিদে এই দরিয়ার। চুপ করে বুঁদ হয়ে আছে বেশ আছে, খিদের জ্বালায়

খেপে উঠতে কতক্ষণ! তখন এর আর এক মূর্তি। সে মূর্তির সামনে এই হাল ধরে দাঁড়াবে তখন কাপ্তেন, আর দরিয়ার চেয়ে দ্বিগুণ হাঁকার মেরে আমাদের হুকুম দেবে, আমরা ঐ পালগুলোর দড়ি-দড়া ধরে ঝুলব।

চুপ মেরে গেলাম। চেপ্টা-মাথা ছোট ছোট ঢেউগুলোর পানে তাকিয়ে মোটেই কোনও বদ সন্দেহ হল না। ঠিক যেন খেলা করছে, অনেকগুলো দামাল ছেলে ফিকে নীল রঙের কাপড় মুড়ি দিয়ে দল বেঁধে হুড়োহুড়ি করছে। এক দল গেল লাফাতে লাফাতে, পেছন পেছন আর এক দল গেল হামাগুড়ি দিয়ে, তার পেছনে আর এক দল সোজা খাড়া হয়ে। প্রত্যেকটি দলই ঐ নীল রঙের কাপড় মুড়ি দেওয়া। দুষ্টুপনার এক শেষ, কার সাধ্য বলবে, কোন দলে কে আছে।

ছেলেখেলার পানে কতক্ষণ চেয়েছিলাম, বলতে পারব না। হঠাৎ এক সময় খেয়াল হল, একটা দীর্ঘ কাহিনী শুনছি। জম্‌শেদ সাহেবের ছেলেবেলার কাহিনী। ওঁর বাবা ছিলেন খুবই নামজাদা এক কাবিল কাপ্তেন। তিন-তিন বার তিনি লড়োছলেন দরিয়ার সঙ্গে, তিনবারই দরিয়া হার মেনেছিল, নৌকা নিয়ে তিনি ঘরে ফিরেছিলেন। চতুর্থবার আর পারলেন না। পারবেন কেমন করে, মস্ত বড় গুণা হয়ে গেল কি না। দরিয়ার সঙ্গে গোস্তাকি চলে না।

গোস্তাকির বিবরণটাও শুনলাম। জম্‌শেদের পিতা জহিরুদ্দিন সাহেব আগাগোড়া ধর্ম-ভীরু মানুষ ছিলেন। ডাঙ্গায় হোক বা দরিয়ায় হোক, তিন ওক্ত নমাজ না পড়া হলে একটি দিনকেও পালাতে দিতেন না তিনি। ফেসাদে পড়ে গেলেন একটা ফিরিঙ্গী মেয়েমানুষকে

দরিয়া থেকে বাঁচিয়ে। একটা জাহাজ থেকে দরিয়ায় ফেলে দিয়েছিল তাকে, একখানা লম্বা চওড়া তক্তার ওপর চিৎ করে শুইয়ে সেই তক্তার সঙ্গে তার গলা বুক কোমর পা কষকষে করে বেঁধে নামিয়ে দিয়েছিল জলে। ভেসে চলছিল দরিয়ার বুকে পুরো দু রাত দু দিন। জলও গেলে নি, মরেও নি। জহিরুদ্দিন কাপ্তেনের নৌকা ফিরে আসছিল দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। দেখতে পেলেন তক্তায় বাঁধা ফিরিঙ্গিনাকে। জল থেকে উঠিয়ে তার প্রাণ বাঁচালেন। তার পর তাকে ঘরে নিয়ে তুললেন। সেটা ছিল একটা ডাইনী, কাপ্তেন জহিরুদ্দিনেরই সে ঘাড় ভাঙলে। পরের বার দরিয়ায় বেরোবার সময় ডাইনীটা কিছুতে জহিরুদ্দিনকে ছাড়তে চাইলে না। অগত্যা তাকে নিয়েই নৌকা ভাসাতে হল। প্রথমে কেউ যেতেই রাজী হয় নি সেই নৌকায়। জহিরুদ্দিন আল্লার নাম নিয়ে অঙ্গীকার করলেন যে দরিয়ার বুকে তিনি ফিরিঙ্গিনীটার সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ ভুলে যাবেন। ফিরিঙ্গিনীটাও বলল, কোনও মতেই বেচালে চলবে না। একবার ডুবে মরতে মরতে বেঁচেছে, আবার কি ডুবে মরবে!

বিশ্বাস করে তেরোটা লোক গেল সেই নৌকায়। একজনও ফিরল না। সাত বছর পরে খোঁজ পাওয়া গেল কাপ্তেন জহিরুদ্দিনের। মাল্ময়ের পথে পথে তিনি ভিক্ষে করে বেড়ান। বদ্ধ পাগল হয়ে গেছেন, দেশের মানুষ আত্মীয় স্বজনকে চিনতেও পারেন না। শুধু হো হো শব্দে হাসেন, আর আকাশ পানে চোখ তুলে মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠেন—আল্লা—আওরত কেন পয়দা করেছিলে?

কেন আওরত পয়দা করেছেন আল্লা-এটা একটা সত্যিকারের

সমস্যা বটে। সমস্যাটি যে কতদূর সর্পিল তা বুঝতে পারলাম জম্‌শেদ সাহেবের দাড়ির টান দেখে। দাড়িতে ছ জাতের টান পড়ে, উজান আর ভাঁটি। গলার দিক থেকে হাত চালিয়ে দাড়িকে ওপর দিকে তোলার নাম উজান-বাওয়া আব ওপর দিক থেকে আঙুল ঢুকিয়ে গলার ওপর দাড়িকে নামানোর নাম ভাঁটি-বাওয়া! উজান ভাঁটি টান দেখে দাড়িওয়ালার মনের অবস্থা বোঝা যায়।

গালপাটা দাড়িতে ভাঁটির টান পড়ায় দাড়ি যত লম্বা হতে লাগল, জম্‌শেদ সাহেবও তেমনি চুপসে যেতে লাগলেন। আন্দাজ করতে পারলাম, আওরত পয়দা করে যে ভুলটি করে ফেলেছেন আল্লা, সেটি পিতা জহিরুদ্দিনের চেয়ে পুত্র জম্‌শেদকেই বেশী কাবু করে ফেলেছে। চুপ করে ওঁর চোখ ছুটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। দরকার কি তাড়াহুড়ো লাগিয়ে, বেরবেই। আল্লার ভুলের দরুন কতদূর বেকায়দায় পড়েছেন জম্‌শেদ সাহেব এটা বুক থেকে বার না করে কিছুতেই উনি স্বস্তি পাবেন না।

হঠাৎ হালখানাকে ছ হাতের মুঠোয় আকড়ে ধরলেন মিঞা। ধরে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বারবার তাকাতে লাগলেন। মুখিয়ে উঠল হঠাৎ একটা শিকারী কুকুর, দূরে কোনও জীব-জন্তুর গন্ধ পেয়েছে যেন।

তটস্থ হয়ে উঠলাম, আমিও গলা উঁচু করে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলাম—না, কোথাও কিছু নজরে পড়ল না। আকাশ বাতাস জল, যার যা কর্ম ঠিকঠাক করে চলেছে। বাঁ দিকে—সেই একেবারে নজরের শেষ সীমানায় একটা ফিকে বেগুনীর রেখা পড়েছে, সেই রেখাটার ওপর মেটে সিঁছুরের আভা দেখা যাচ্ছে। প্রকাণ্ড একখানা

রুপোর থালা অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে সেই বেগুনী আর মেটে সিঁদুরের রেখাটার দিকে। ফিকে নীল কাপড় মুড়ি দিয়ে যারা হুড়োহুড়ি করছিল, তারা শুধু নেই। নীল কাপড়ের বদলে ঘোলা জল স্থির হয়ে আছে। কোথাও একটুও ফেঁপে ফুলে উঠছে না।

তাকালাম আবার জমৃশেদ সাহেবের মুখের দিকে, তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে ওপর দিকে মুখ তুলে পালগুলোর পানে তাকালাম। নেতিয়ে পড়েছে সব কখানি পাল, একখানিরও যেন প্রাণ নেই। অগুণতি দড়িদড়া ঝুলছে চারিদিকে, কোনও দড়িতে আর টান নেই।

নৌকার সামনে থেকে কে যেন কি সুর করে বলে উঠল। সেই সুরে সুর মিলিয়ে আর একজন জবাব দিলে। খরখর আওয়াজ উঠল চারিদিক থেকে। বনবন করে ঘুরতে লাগল অনেকগুলো কপিকলের চাকা, একে একে সবগুলো পাল নেমে এল। মুখ বুজে টানাটানি করতে লাগল সব কটি মানুষ, দড়ি গোছানো, পাল পাট করা, পাল দড়ি লোহার সিন্দুকে পুরে চাবি দেওয়া সব কর্ম সুশৃঙ্খলে সমাধা হয়ে গেল।

নৌকার মাস্তুলের দু পাশে মস্ত বড় বড় দুই লোহার সিন্দুক বসানো রয়েছে। তিন চার সের ওজনের একটা করে তালা ঝুলছে সিন্দুকে। সিন্দুক দুটো আগেই লক্ষ্য করেছিলাম। কি সম্পত্তি থাকে ওতে জানতে পারলাম। অতগুলো পাল আর ঐ ছিষ্টির দড়ি অগোছাল হয়ে পড়ে থাকতে পারে না! দরকারের সময় জট ছাড়াতে ছাড়াতেই যে বাজী-ভোর হয়ে যাবে। তাই যখন যে পালখানি নামানো হয় তখনই সেখানিকে দড়ি-দড়া সুদ্ধ গুছিয়ে তুলে রাখা নিয়ম। তুলে রাখতে হবে একেবারে সিন্দুকে। কে বলতে পারে,

কখন একটা ঢেউ লাফিয়ে উঠবে নৌকার ওপর। উঠে এক ঝাপটায় পালখানাকে একেবারে লোপাট করে নিয়ে যাবে।

হতভম্ব হয়ে ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি দেখতে লাগলাম। হল কি রে বাপু। বলছে না কেউ কিছু মুখে, দম-দেওয়া কতকগুলো কলের পুতুল যেন কাজ করে চলেছে। কাজ কর্ম শেষ হতে মিনিট-পাঁচেকও লাগল না। ওধারে—পাঁচ পাঁচ দশখানা দাঁড়-বাঁধা হয়ে গেল নৌকার দু পাশে। দু মুঠোয় দাঁড়ের ডগা ধরে দাঁড়াল দশজন জোয়ান। শুরু হয়ে গেল গান, গানের তালে তালে দশখানা দাঁড় একসঙ্গে ওঠা-নামা করতে লাগল।

গান নয় গোঙানি। সমবেত কণ্ঠে গোঙাতে লাগল দশখানা দাঁড়। কঁা—উঁ—উঁ—উঁ—উঁচ্ ঝপ্, কঁা—উঁ—উঁ—উঁ—উঁচ্ ঝপ্, এক ঘেয়ে আওয়াজ এক রকম বোল তুলে ককাতে লাগল। কাঠের গোঁজের সঙ্গে নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা কাঠের দাঁড় লাগল ঘষড়াতে। নৌকার চাকা বিনা তেলে চলে। বিচ্ছিরী আওয়াজ বন্ধ করার কোনও উপায় নেই।

যাত্রীগণ যে যেখানে ছিলেন উঠে এলেন। কৈকেয়ীনন্দন এবং পরমানন্দজীকে দেখা গেল। ওধারে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন লাঠিতে ভর দিয়ে। তাঁর চেয়ে অনেক বেশী বয়েসের একটি মহিলা পাশে দাঁড়িয়ে দু হাতে তাঁর বাঁ কনুইয়ের ওপরটা খামচে ধরে রইলেন। ওঁদের সাজপোশাক চেহারা নিঃশব্দে ঘোষণা করছে যে ওঁরা বোম্বাইবাসী পার্শী। অত দীর্ঘ শরীর, অমন রঙ্, দীর্ঘ নাক আর লম্বা ধাঁচের মুখ এক মাত্র পার্শীদেরই দেখা যায়। তার পর আছে টুপি আর কোট। পার্শী ছাড়া আর কার গরজ পড়েছে, দরিয়ার

বুকে নৌকার ওপর টুপি কোট চড়িয়ে টঙ্ হয়ে থাকতে যাবে। জীবনে বহু পার্শীকে বহু রকমের অবস্থায় দেখেছি, কিন্তু কখনও কাকেও কোন টুপি ছাড়া দেখছি বলে কিছুতেই মনে করতে পারি না। আর পার্শী মহিলাদের শাড়ি। তুনিয়ায় কত জাতের কত রকম পাড়ের শাড়ি বেরিয়েছে, পার্শী মহিলারা সে সব ফ্যাশানের ধার ধারেন না। তাঁদের হল এক রকমের পছন্দ। খুব দামী সিল্ক, ঘোর কালো বা বাদামী বা একদম সাদা হলে খুবই ভাল হয়। সেই সিল্কের থানে ইঞ্চি-খানেক বা ইঞ্চি-দেড়েক চওড়া পাড় বসিয়ে নিতে হবে। ব্যাস—চুকে গেল লেঠা। কে যায় হাজার জাতের ফ্যাশানের খোঁজ-খবর রাখতে। বহু জাতের খোলস পালটানো যাঁদের স্বভাব, তাঁদের রুচির নিন্দে করা অনুচিত। কিন্তু এ কথা মানতে বাধ্য যে তাঁদের চিনতে ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। বাঙ্লা-মাদ্রাজ মারাঠা উড়িষ্যা আর পাঞ্জাব, এই পাঁচ জায়গার মহিলারা আধুনিক ফ্যাশানে সেজে উপস্থিত হন এক জায়গায় এবং মুখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকুন। বলুক দেখি তখন কেউ, কে কোন্ প্রদেশের মেয়ে। ভাগ্যে-বিধাতা মহিলাদের মুখ বন্ধ থাকার জন্যে সৃষ্টি করেন নি। মিনিট-তিনেক অপেক্ষা করলেই হল, মহিলাদের জবান খুলে যাবে। আর তখন তাঁদের আসল পরিচয় পেতে একটু কষ্ট হবে না।

আসল পরিচয় অনেক নীচে তলিয়ে থাকে। যেমন দরিয়ার দিল। অগাধ জলের তলায় কখন কি মর্জি উথলে উঠেছে দরিয়ার দিলে, তা কে বুঝবে। ভৈরবী অবশ্য আন্দাজ করতে পারেন খানিকটা, কারণ তিনি বরিশালের শেষ প্রান্তের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। ভূমিষ্ঠ

হয়েই দরিয়া দেখেছেন, দরিয়ার হাঁকার শুনেছেন, বাপ-দাদার সঙ্গে লোনা জলে নাকানি চুবানি খেয়েছেন। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি নৌকার ধারে, ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখতে লাগলেন জলের মধ্যে। মিনিটখানেক বা মিনিট দু-এক পরে সোজা হয়ে ঘোষণা করলেন—খুব কাছেই ডাঙা আছে বা কোনও নদী এসে পড়েছে আশে পাশে। জলে কাদা দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের ভেতর আর নেই আমরা, খুব সম্ভব একটা নদীর মুখ পার হচ্ছি।

ব্যাপারটা জম্‌শেদ সাহেবকে বললাম। ভারী খুশী হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, একদম মিলে গেছে। রাত লাগলেই আমরা এক আজব-মুল্লুকে ঢুকে পড়ব। দেখবেন কাল সকালে, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলেছি। কাল সারা দিন গুণ টেনে এগতে হবে। আবার দরিয়ায় পড়ব সেই পরশু দিন। কালকের দিনটা ভারী তকলিফ উঠোতে হবে সকলকে, বাতাসটাও আবার পড়ে গেল।

বাতাস সত্যিই একদম পড়ে গেল। নৌকার ওপর প্রত্যেকটি প্রাণী দরদর করে ঘামতে লাগল। ক্রমেই কালো হয়ে উঠল জল, জলের রঙ আকাশের মুখে গিয়ে লাগল। ঘনিয়ে উঠল রাত্রি, আমি আর জম্‌শেদজী ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম।

জী এবং মিঞা, এই বাক্য দুটির অর্থ এক। জম্‌শেদজী কথাটার মূল্য জানেন, মিঞার মানে বোঝেন না। বললাম—আমাদের ওধারে আপনার মত সম্মানী মানুষকে আমরা মিঞা বা সাহেব বলি, জী বলতে আমাদের জিভে আটকায়।

জম্‌শেদ সাহেব আলতো ভাবে বারকতক মিঞা উচ্চারণ করার চেষ্টা করলেন।

মিঞা মিয়া হয়ে গেল। কি কায়দায় মিয়াকে মিঞাতে দাঁড় করানো যায় সেটা কিছুতেই ধরতে পারলেন না। অবশেষে চটে উঠে বললেন—তুত্তোর, মিয়ার নিকুচি করেছে। ওই ভাবে বাত বলতে পারে আওরতরা। তোমাদের ওধারে সবাই আওরত নাকি! মরদকে কেউ ও ভাবে ডাকতে পারে! মরদটা তাহলে খেপে উঠবে না?

বললাম—চটে তো ওঠেই। চটে না উঠলে আর মজা কোথায়। মিঞা চটবেন, বিবি ঠাণ্ডা করবেন, এই তো দুনিয়ার খেল্। মিঞাদের চটিয়ে দিতে না পারলে বিবিরা খেলিয়ে তুলতে পারেন না কিনা। চটাচটি না থাকলে মিঞা-বিবির মধ্যে টান থাকবে কেন।

কি বুঝলেন জম্‌শেদ সাহেব বলতে পারব না। অন্ধকারে তাঁর মুখ দেখতে পেলাম না। খুব লম্বা একটা শ্বাসের শব্দ কানে গেল। একটু পরে প্রায় চুপিচুপি উচ্চারণ করলেন—আল্লা, কেন তুমি আওরত পয়দা করেছিলে।

॥ চার ॥

কান্না চলতে লাগল, এক ঘেয়ে সুরের এক তালের অতি বিদকুটে গোঙানি। পড়তে লাগল কোপ, ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্ সমানে কোপ পড়তে লাগল ঢেউয়ের ওপর। দশখানা দাঁড় নয়, দশখানা খাঁড়া। দশখানা খাঁড়া উঠছে আর নামছে। কাটতে কাটতে কমতে লাগল দ্বিতীয় রাত, ককিয়ে ককিয়ে কাঁদতে লাগল সময়। সময়-সমুদ্রের বুকে কোপ মারতে মারতে আমরা ভেসে চললাম।

সময়-সমুদ্রের বুকে পাড়ি দিচ্ছি। সময়-সমুদ্রে পাড়ি দিতে হলে নৌকার চাকায় যথেষ্ট পরিমাণে তৈল-সিঞ্চন করা লাগে। মহা-মাস তৈল, মানুষের পেশী নিঙ্ড়ে সেই তৈল নিষ্কাশিত হয়। দশটা মানুষের দশ-জোড়া পেশী সমানে মেলছে গুটচ্ছে, গুটচ্ছে মেলছে। নিঙ্ড়ে নিঙ্ড়ে বেরচ্ছে মহা-মাস-তৈল, তবু বিচ্ছিরী গোঙানিটা ঘুচছে না। মহা-মাস তৈলের সাধ্য কি, সময়ের কান্না ঘোচায়!

জম্‌শেদ্ মিঞা সময়ের বুকে অনেক দূর পাড়ি দিয়েছেন, অনেক বার সময়-সমুদ্রকে ডিঙিয়েছেন, কিন্তু এসপার-ওসপার কিছুতেই হল না। আজও খুঁজে পেলেন না সেই দুশমনকে। করাচী থেকে কুমারিকা আর ওধারে মাদ্রাজ কলকাতা রেঙুন পর্যন্ত যেখানে যত ঘাট আছে, সব ঘাটে ঘাটে বার বার খুঁজেছেন তিনি তাঁর দুশমনকে, খুঁজতে খুঁজতে সময় কেটে গেল। সময়ের পুঁজি ফুরিয়ে এল প্রায়, এসপার ওসপারটা করতে পারলেন না।

শুনতে লাগলাম সময়ের গোঙানি, জম্‌শেদ্ সাহেবের আসনের দেড় হাত নীচে বসে ওঁর আসনের কিনারায় মাথা হেলিয়ে এক মনে শুনে গেলাম। শুনতে শুনতে একটু একটু করে মনের নজরে গড়ে উঠল এক আওরত। দু-হাতের মুঠোয় তার কোমর ধরা যায় কিন্তু মুশকিল হচ্ছে দৌড়ে তার নাগাল পাবার যো নেই। ডাঙায় দৌড় আর জলে সাঁতার, দুয়েতেই সমান। সে আওরতকে ধরে রাখাই বিষম দায়। পিছলে পালিয়ে যাবেই।

সে হল এক পুবদেশের মেয়ে। তার বাবা ছিল এক কলের জাহাজে কয়লা ঠেলবার খালাসী। মায়ের সঙ্গে থাকলে মেয়ে

পাছে খারাপ হয়ে যায়, এই ভয়ে মেয়েকে পুরুষ সাজিয়ে জাহাজে তুলে ফেলেছিল বাপ। পুরুষ সাজালে কি হবে, কম-বয়সী পুরুষের পক্ষেও দরিয়ার জাহাজে খালাসীর কাজ নেওয়া বিষম বিপদ। বোম্বাইতে জাহাজ ছেড়ে নেমে পড়তে হল বাপ-বেটীকে। তারপর এক নৌকার দাঁড় টানতে টানতে পৌঁছে গেল তারা কচ্ছের কূলে। কচ্ছের কূলে মাটি নেই, আছে পাথর আর কাঁকর। সেই কাঁকর চিবোবার জন্যে পাথর কামড়ে তারা পড়ে রইল। কিছুতেই আর দরিয়ায় ভাসল না।

জম্‌শেদ তখনও দরিয়ায় ভাসেন নি। মনটা তখনও তাঁর পানি পানি হয়ে যায় নি। মন দিয়ে তখন খুন ঝরবার বয়স তাঁর, সেই খুনের রঙে রঙ্‌ মিলিয়ে দুনিয়াখানা তখন তাঁর নজরে স্রেফ লালে লাল। কচ্ছের কূলে পাথর কাঁকর নুড়ির মধ্যে সাঁচ্চা জহরত তিনি খুঁজে পেলেন। পুব দেশের কন্যে অসতর্ক মুহূর্তে জম্‌শেদ সাহেবের কাছে সাঁচ্চা পরিচয় দিয়ে ফেললে। বাস্‌ আর যাবে কোথায়! জম্‌শেদের মনের খুনে তখন আগুন লেগে গেল। খুনখারাপি রঙের ফুলঝুরির ফুল ছড়িয়ে পড়তে লাগল নজরের সামনে। পাথর কাঁকর নোড়া-নুড়ি সব লালে লাল হয়ে গেল।

মৌসুমও সেবার পানি ঢাললে না, ঢাললে আশমানী আবীর। ইয়াঃ! সে যা সময় কাটতে লাগল! কেউ টের পেল না আসল ব্যাপার, সবাই জানল ছোকরার সঙ্গে ছোকরার দোস্তি। কেউ কোনও সন্দেহ করল না। মহব্বতের মহার্ণবে দু জনে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। আশনাই ব্যাপারটার ভেতর যতক্ষণ লুকোচুরির লালসানি থাকে ততক্ষণই তার আস্বাদ, যেমন ঝাঁঝাল তেমনি মিষ্টি। তার পর

পানি, একদম দরিয়ার পানি। নোনৃতা তেতো আর টক্। জিভে ছোঁয়ালে জিভখানা অসাড় হয়ে যায়।

কোথায় যেন কিসের গাঁট খুলে গেল। অনেকগুলো মণি-মুক্তো ছিল লুকনো, গাঁটের ওপর গাঁট দিয়ে সযত্নে আড়ালে তোলা ছিল। সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। কুড়বো কি, মুখ তুলে আর তাকাতে পারি নে সেগুলোর পানে। ধরা পড়বার ভয়ে দম আটকে এসেছে তখন, মুখখানা কোথাও গুঁজতে পেলে বাঁচি।

ওপরে আকাশ নীচে জল। আকাশের মনে আর জলের মনে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গিয়েছে। এ ওর মনের খবর জেনে ফেলেছে। আকাশের মনে লক্ষ দীপ জ্বলে উঠেছে, সেই লক্ষ দীপের স্নিগ্ধ জ্যোতি জলের বুকের আঁধার ঘুচিয়েছে। ভয়ানক জানাজানির রাজত্বে নিজের পানে তাকিয়ে ভারী বেআবরু বলে মনে হল। তীক্ষ্ণ নজরে দেখে নিলাম জম্‌শেদের চোখ দু'টি। লোকটা কিছু দেখতে পেলে নাকি!

ভাগ্যে পায় না! সবাই সবায়ের মনের খবর ভাগ্যে জানতে পারে না! তবু সাবধান হতে হল। ভয়ানক বিচ্ছিরী বেআবরু জায়গা ঐ সমুদ্র। সমুদ্রের বুকে খোলা নৌকায় শুয়ে আকাশের দিকে তাকালে ভারী ভয় হয়। মনের মণিকোঠায় অতি সঙ্গোপনে যা জমানো আছে, গেল বুঝি সেই সব সম্পত্তি পাঁচ জনের নজরে পড়ে! ভারী ভয় হয়—

জম্‌শেদ তখনও বলে চলেছেন তাঁর সেই পুব দেশের কন্যের কাহিনী। শুনছি আবার শুনছিও না। মনে মনে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে

গেলে কানের কাছে কে আর হত্যে দিতে যায়! কানকে রেহাই দিয়ে মন তখন ছুটে চলে গেছে। জম্‌শেদের মনের সঙ্গে সেই কচ্ছের কূলে নোড়া-নুড়ির রাজত্বে। মনের নয়ন ছুটির সাহায্যে স্পষ্ট দেখতে লাগলাম সব। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, এতটুকু একটু মুখ, ভয়ানক জ্বলজ্বলে আর ভয়ঙ্কর দুষ্টু চাউনি ভরা দুটো কালো চোখ, এই হাত তিনেক উঁচু একটা ছোকরা তীরবেগে ছুটছে। টপ টপ টপকে চলছে বড় বড় পাথরের চাঙ্গড়গুলো, টুপ করে বসে পড়ছে মস্ত মস্ত পাথরের আড়ালে। পরনে তার গোছ পর্যন্ত ঢাকা মোটা কাপড়ের পাজামা, ওপরে ডোরা-কাটা গলা-বন্ধ গেঞ্জি, গেঞ্জির গোড়াটা ঢোকানো আছে পাজামার মধ্যে। কোমরে শক্ত করে-চামড়ার কোমর-বন্ধ আঁটা, এমন সরু কোমর যে দু হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরা যায়। ঐ জাতের কোমর থাকার দরুনই বোধ হয় ছোকরা হরিণের মত ছুটছে লাফাচ্ছে টুপ করে লুকিয়ে পড়ছে। একদম বেহাল করে ছেড়েছে তার খেলার সাথীকে। তার অপরাধ সে অত হালকা নয়, সে অমন হরিণের মত লাফাতে পারে না দৌড়তে পারে না। তাই কিছুতে ধরতে ছুঁতে পারে না ছোকরাকে। অসাধ্য কাণ্ড যে, অমন ভাবে ছুটোছুটি করলে কতক্ষণ দম থাকে!

দিনের পর দিন নিরিবিলিতে সাগর-বেলায় এই ছুটোছুটি, দুটি প্রাণীর এই লুকোচুরি খেলা অবাধে চলতে লাগল। এ ওর ভাষা বোঝে না, ওকে এ বিশ্বাস করে না। তবু যেন কিসের টানে দুজনকেই লুকিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। ঠিক আন্দাজ করতে পারে দুজনে, কখন কোনখানে এ ওর দেখা পাবে। দেখা হলেই শুরু হল ছুটোছুটি, কিছুতেই এ ওকে ধরতে ছুঁতে দেবে না। ছুটোছুটির চোটে

একান্ত হাল্লাক হয়ে পড়লে পর দু জন পাশাপাশি বসবে একখানা পাথরের ওপর চেপে। বসে থাকবে শুধু পাশাপাশি দুজনে দরিয়ার দিকে তাকিয়ে, দরিয়া এর মনের কথা ওর মনে চালান করে দেবে। দরিয়ার মত বন্ধু নেই, দরিয়া একজনের মনকে অপরের মনে মিশিয়ে দিতে পারে। একে অন্যের ভাষা না বুঝলে কি হল, দরিয়ার ভাষায় তখন দুজনের মনে মনে আলাপ শুরু হয়ে যায়।

তার পর এক দিন দরিয়াই সত্যিকারের পরিচয়টা জানিয়ে দিলে। পায়ের গোছ পর্যন্ত মোটা কাপড়ে ঢাকা কোমর সরু ছোকরাটা আর ছোকরা রইল না। ভেল্কী-বাজির মন্ত্র পড়ে দরিয়া আস্ত একটা ছোকরাকে একদম ছুকরী বানিয়ে দিলে। সেই বিস্ময়, আচমকা সেই অদ্ভুত কাণ্ড, জমশেদ্ একদম বেকুব বনে গেলেন।

বেকুব আমিও কম বনলাম না।

জম্‌শেদ সাহেব যখন ছোটাছুটি করে হায়রান হচ্ছিলেন সেই পুব দেশের কন্যের পেছনে, তখন তো তার আসল পরিচয় তিনি জানতেন না। জানতেন রিহাহুদ্দিন বলে, ফরিদুদ্দিনের ছেলে রিহাহুদ্দিন। সেই রিহাহুদ্দিন দরিয়ার দৌলতে আচমকা হয়ে গেল রিহান্ খাতুন। তা হলে!

মস্ত বড় একটা—তা হলে!

তা হলে কিসের টানে অমন ভাবে ছুটে মরছিলেন জম্‌শেদ সাহেব!

পরদিন সকালে পরমানন্দজীকে শুধিয়েছিলাম। তিনি তাঁর সেই মার্কা-মারা পারদ-তত্ত্ব আমদানি করে ফেললেন।

বললেন—ধাতু, বিভিন্ন জাতের ধাতু থেকে উৎপন্ন এই ধরিত্রী।

অবিশ্রান্ত এক ধাতু অন্য ধাতুতে পরিণত হওয়ার নাম জন্ম মৃত্যু। এই জন্ম মৃত্যু বা রূপান্তর গ্রহণের ভেতরেও সারবস্তু একটা কিছু আছে। সেটা মরে না, সেটার রূপও পালটায় না, সেইটে নির্বিঘ্নে বজায় থাকে। কেউ বলে তাকে প্রাণ, কেউ বলে জীবন, কেউ আত্মা। বলুক যার যা খুশি, আসলে জিনিসটা হচ্ছে ঐ শিব-বার্য, ঐ পারদ। পারদের যে পারদত্ব, সেইটুকুই হচ্ছে সারবস্তু। মানুষ জীব জন্তু গাছ পাথর কীট অনুকীট, এই সৃষ্টিটার মূলে আছে ঐ বস্তু—পারদের পারদত্ব। অনির্বাণ জ্বলছে, মহাজ্যোতি ফুটে বেরচ্ছে তা থেকে। তোমাতেও আছে আমাতেও আছে। একই জিনিস, একই গুণ, একই তেজ। আধার-ভেদে ঐ পদার্থ ভিন্ন রকম আলো দেয়। এক আধারের পারদ আর এক আধারের পারদকে আকর্ষণ করে। তখনই করে যখন এক আধারের আলো অপর আধারের আলোর সঙ্গে মিলে যায়। প্রেম বন্ধুত্ব ভালবাসা সব ঐ পারদ-ঘটিত-ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নয়।

জলের মত তরল ব্যাপার, বুঝতে একটুও কষ্ট হল না।

থাক পরমানন্দজীর পারদ-তত্ত্ব এখন, আগে সেই রাতের কথা শেষ করি। দ্বিতীয় রাত সমুদ্রের বুকে,—প্রথম রাতটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ফুরিয়ে গেছে। দ্বিতীয় রাতটা আর লোকসান হল না। ফরিদুদ্দিন এবং তাঁর কন্যের কাহিনী শুনলাম। পুব দেশের মানুষ ছিলেন ফরিদুদ্দিন সাহেব,—জাহাজে কয়লা ঠেলার খালাসী ছিলেন। তাঁর কন্যার নাম রিহান্ খাতুন। কন্যেকে লম্বা পাজামা পরিয়ে আর গলা-বন্ধ গেঞ্জা দিয়ে ঢেকে জাহাজে তুলে নিয়ে পালাচ্ছিলেন তিনি। জাহাজে কমবয়সী খালাসী ছোকরার বিপদ কম নয়। অগত্যা ফরিদুদ্দিন

মেয়ে নিয়ে নেমে পড়লেন বোম্বাইতে। তাঁর পর নৌকার দাঁড় টানতে টানতে চলে এলেন কচ্ছের কূলে। নারকেল সুপুরি আম কাঁটাল ধান পাট,—পুব দেশের জল, পুব দেশের মাটি, মাটি নয় সোনার তাল, সব ভুলে গেলেন মেয়ের জন্যে। মেয়েকে তিনি কিছুতেই নষ্ট হতে দেবেন না।

জমৃশেদ সাহেব আশমানের দিকে মুখ তুলে আর একবার উচ্চারণ করলেন—আল্লা, কেন তাকে আওরত বানিয়েছিলে? আওরত যদি সে না হত, তা হলে নিশ্চয়ই তাকে ধরে রাখতে পারতাম। কিছুতেই সে আমার মুঠো ফসকে পালাতে পারত না।

অনেক উঁচুতে আল্লার দরবারে জমৃশেদের এই বুক-নিঙ্ড়ানো অভিযোগ পেঁাছল কি না, কে জানে! আশমান কিন্তু মুখ কালো করে ফেলল। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আশমানে একটি চেরাগ নেই, সব নিভে গেছে। সাগরের বুকেও রোশনাই নেই, সামনে পেছনে যতদূর নজর যায়, সব যেন আলকাতরা দিয়ে লেপে দেওয়া হয়েছে। নৌকার ওপর জ্বলছে গোটা তিন চার হ্যারিকেন লণ্ঠন। সেগুলোর আলো তিন হাত তফাতে পেঁাছচ্ছে না।

সেই আলোয় দেখা গেল এক আঁধার দিয়ে গড়া মূর্ত্তি এগিয়ে আসছে। অবয়বের আয়তন দেখেই চিনতে পারলাম সেই মূর্তির অধিকারীকে। সাক্ষাৎ কাপ্তেন সাহেব, নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে, হাল ধরতে আসছেন। দিনের বেলা উনিই আমাদের ডাকতে গিয়েছিলেন পারশে মাছদের সৎকার করার জন্যে। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসে যথা-সম্ভব সম্মান নিবেদন করলাম।

কাপ্তেন সাহেব সেটা গ্রাহ্যও করলেন না। সোজা উঠে গেলেন

জম্‌শেদের মাচার ওপর। ততক্ষণে জম্‌শেদও উঠে দাঁড়িয়েছেন দু হাতে হাল বাগিয়ে ধরে। কাপ্তেন গিয়ে দাঁড়ালেন জম্‌শেদের পাশে, দু হাতে তাঁর দু কাঁধ ধরে প্রচণ্ড জোরে দুই ঝাঁকুনি দিলেন। সাগরের বুকে সাগরের রাত থরথর করে কেঁপে উঠল কাপ্তেন সাহেবের গলার কসরতে। কি যে বললেন তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। মনে হল যেন সাবাস দিলেন জম্‌শেদকে। সাবাস দিয়ে হালখানাকে একটু ঘুরিয়ে একটু উঁচু করে তুলে ডগাটা শক্ত করে বেঁধে দিলেন একটা লোহার আংটার সঙ্গে। তার পর আবার নেমে গেলেন মাচা থেকে, নামবার আগে আবার দুই বিরাট থাপ্পড় লাগালেন জম্‌শেদের দুই কাঁধে। থাপ্পড়ের শব্দ সাগরতরঙ্গে মিশে দূরে অনেক দূরে ছুটে পালাল।

তখন আবার শুরু হল সেই রিহান্‌ খাতুনের কথা। কি করে তার আসল পরিচয় জানতে পারলেন জম্‌শেদ সেই কাহিনী শোনালেন। কচ্ছের কূলে মাঝে মধ্যে দু-একটা শাঁখ উঠে পড়ে। উঠে পড়ে অর্থে আটকে যায়। জল যখন বাড়ে পাথর নোড়া-নুড়ি সব ডুবে যায়। জল যখন কমে তখন সেই নোড়া-নুড়ির জঙ্গলে কিম্ভূতকিমাকার সব জানোয়ার আটকা পড়ে। জ্যান্ত শাঁখ বড় বীভৎস-দর্শন জীব। চারি দিক থেকে জটাজুটো ঝুলে আছে, কালো রঙের এক ডেলা জ্যান্ত মাংস যেন। জল নেমে গেলে চুপচাপ কোনও পাথরের ফাঁকে লুকিয়ে বসে থাকে।

একদিন হল কি, রিহানুদ্দিন সাগর-বেলায় ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেল এক জ্যান্ত শাঁখ। শাঁখকে শাঁখ বলে চিনতে পারলে না। কি জানি কি মনে করে তাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে বাড়ি চলল।

ঘাড়ের ওপর বসে শাঁখের ঘুম গেল ভেঙে, আস্তে আস্তে তার শুঁড়টা বার করে রিহাসুদ্দিনের গলার নরম মাংস চিমটে ধরল।

আর যায় কোথায়! আতকে উঠে রিহাসুদ্দিন সেখানে হুঁশ হারিয়ে পড়ে রইল।

তার পর শুরু হল খোঁজাখুঁজি। ফরিতুদ্দিন পাগলের মত বুক চাপড়াতে লাগল। বেরল গ্রাম সুদ্ধু মানুষ তার ছেলেকে খুঁজে বার করতে। জম্‌শেদও বেরলেন। জম্‌শেদই এক মাত্র মানুষ, যিনি আন্দাজ করতে পারলেন কোথায় গেছে রিহাসুদ্দিন। সোজা তিনি চলে গেলেন সেখানে। মস্ত বড় বড় পাথরের চাঙ্গড়ের মধ্যে তাকে খুঁজে পেলেন। রিহাসুদ্দিন চক্ষু বুজে পড়ে আছে, আর শাঁখটা তার বুকের ওপর বসে শান্তিতে রোদ পোয়াচ্ছে।

লাফিয়ে পড়লেন জম্‌শেদ তার বুকের ওপর। বুকে কান ঠেকিয়ে শুনতে গেলেন, ধুকধুকুনিটা থেমে গেছে কি না!

রিহাসুদ্দিনের বুকের ওপর নিজের কান গাল চেপে ধরবার পরেই আড়ষ্ট হয়ে গেলেন তিনি। মুখ তুলে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন সেই বেহুঁশ প্রাণীটার দিকে। তখন খুলে ফেললেন তার সরু কোমরের চামড়ার কোমরবন্ধ। গেঞ্জীটা তুললেন একটু। তার পর—আস্তে আস্তে পাজামাটাও টেনে নামালেন খানিকটা। শরীরের খুনে আগুন ধরে গেল জম্‌শেদ সাহেবের। তবু তিনি নিজের মাথাটাকে ঠিক রাখলেন। গেঞ্জী নামিয়ে পাজামার মধ্যে ঢুকিয়ে কোমরে আবার কোমরবন্ধ কষে দিলেন ভাল করে। কোথাও একটুও খুঁত রাখলেন না। তার পর সবাইকে ডেকে জড়ো করে রিহাসুদ্দিনকে দেখিয়ে দিলেন।

আসল লুকোচুরি খেলা এইবার শুরু হল। জম্‌শেদ জানেন রিহানুদ্দিনের সাঁচ্চা পরিচয়। রিহানুদ্দিন জানে, জম্‌শেদ তাকে চেনেন না। ভারী মজা লাগল জম্‌শেদ সাহেবের, বোকার মত তিনি রিহানুদ্দিনকে তখনও ঝাপটে ধরতে যান। রিহানুদ্দিন পালায়, ছুটো-ছুটি করে, ধরে ফেললেও পিছলে যায়। আবার হাঁপিয়ে পড়লে পাশে এসে বসে চুপটি করে দরিয়ার পানে তাকিয়ে থাকে। মোটে ভয় নেই। থাকবে কেন, জম্‌শেদ যে তার আসল পরিচয় জানে না।

মৌসুমী নেমেছে, মিশে গেছে আকাশের সঙ্গে দরিয়া। দরিয়ার ওপার থেকে—দলে দলে মেঘরা এসে জমছে কচ্ছের কূলে। কাছের মানুষ আরও কাছে সরে আসছে। মৌসুমের হাওয়া সবাইকে ঘরে ঘরে বন্ধ করে ফেলেছে। ঐ হাওয়ার একটা বদ দোষ হল, মানুষ ভয়ানক বেসামাল হয়ে পড়ে। নিজের ওপর মানুষের চোখ রাঙাবার ক্ষমতা কমে যায়। কেমন যেন বড্ড একা একা মনে হয় নিজেকে, তাই যে যার মনের মানুষের মন ঘেঁষে ঠাঁই নিতে চায়।

ঝড় জলের রাত সেটা। জম্‌শেদ বেরিয়ে পড়লেন। গিয়ে দাঁড়ালেন রিহানুদ্দিনের ঘরের পাশে। আস্তে কয়েকটা টোকা দিলেন ওদের দেওয়ালে। দেওয়াল মানে বেড়া, শুকনো শরগাছের বেড়া বেঁধে ঘরের দেওয়াল হয়েছে। সেই দেওয়ালে কয়েকটা টোকা দিয়ে আস্ত বেকুবের মত দাঁড়িয়ে তিনি ভিজতে লাগলেন।

সে কি জেগে আছে! সে কি শুনতে পাবে! শুনতে পেয়ে বেরিয়ে আসবে এই ঝড় জলে!

অসম্ভব আশা, কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ এ ভাবে কেন সে বেরতে যাবে! কি করে সে বুঝবে যে কে ডাকছে। টোকার শব্দ

শুনতে পেলেও হয়তো বেরতে সাহস করবে না, হয়তো বাপকেই ডেকে তুলবে। তার পর ধরা পড়বেন জমশেদ, ধরা পড়ে ও ভাবে ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার কোনও জবাব দিতে পারবেন না।

তবু তিনি সেখান থেকে এক পা নড়তে পারলেন না। পা দুখানা যেন সেখানে শিকড় গেড়ে বসে গেল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে তিনি ভিজতে লাগলেন।

আর সেই রাতেই রিহানুদ্দিন আসল রিহান খাতুন হয়ে তাঁর কাছে ধরা দিলে।

অনেকক্ষণ পরে, কতক্ষণ পরে তা জম্‌শেদ সাহেব বলতে পারবেন না, হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, একটা ছায়ামূর্তির পাশে পাশে তিনি হেঁটে চলেছেন। কখন সে এসেছিল, কি বলে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তাও তার খেয়াল নেই। বড় বড় কয়েকখানা নৌকা উপুড় করা ছিল খানিক দূরে চড়ার ওপর। হামাগুড়ি দিয়ে একখানা নৌকার পেটে ঢুকে পড়লেন দুজনে। নৌকার ওপর প্রচণ্ড ঝড় জল চলতে লাগল। সে রাত্রে এক প্রাণী সজাগ ছিল না। অমন মৌসুমী রাতে কে জেগে থাকে। উপুড় করা নৌকার মধ্যে যারা দুজন রইল, তারা কিন্তু ঘুমোল না। কেউ কাউকে ঠকাবার চেষ্টা করল না। এ ওকে ও একে নিঃশেষে নিজেদের উজাড় করে দিয়ে দিলে। মৌসুমী দরিয়া ওধারে আথাল পাথাল করতে লাগল। দরিয়া ঘুমোতে জানে না।

॥ পাঁচ ॥

আমরাও কেউ ঘুমোলাম না। ঘোরতর মসিবর্ণ একখানি উপুড় করা সরার তলায় আর একখানি ফিকে কালো রঙের সরার পিঠে ঠিক মাঝখানটিতে সব থেকে উঁচু জায়গায় আমাদের নৌকাখানি চড়ে বসে রইল। কোথাও এতটুকু নড়াচড়া নেই। দরিয়ার আথালিপাথালি থেমে গেছে, নৌকাও পড়ল ঘুমিয়ে। দশখানা দাঁড়ের ককানিটা যেন নৌকার নাসিকা-গর্জন। অমন আরামের জায়গায় অমন নিরিবিলিতে ঘুমতে পেলে কার না নাক ডাকে।

ক্রমেই ওপরের সরাখানি নেমে আসতে লাগল নীচের সরাখানির কাছে। একটা উপুড় করা সরার পিঠে আর একখানা উপুড় করা সরা চেপে বসবে। ফলে ঘুমন্ত নৌকাখানা চিঁড়ে-চেপটা হয়ে যাবে একেবারে।

পালাবার উপায় নেই। পালিয়ে পরিত্রাণ পাব তেমন ঠাঁই কোথায়। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। নিরিবিলি যাকে বলে, পুব দেশের কন্যে রিহান খাতুনকে নিয়ে জমশেদ সাহেব যে উপুড় করা নৌকার তলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তার চেয়ে ঢের নিরিবিলি। সেই ঝড়-জলের রাতে যদি কেউ জেগে থাকত জমশেদ সাহেবের গাঁয়ে, যদি সে ঝড় জলের পরোয়া না করে খুঁজে বার করত ওঁদের, তা হলেই ঘটেছিল চিত্তির। আমাদের কিন্তু সে ভয় নেই, কেউ নেই কোথাও, ঘুমিয়েও নেই কেউ। বেবাক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডখানাই লোপাট হয়ে গেছে। থাকবার মধ্যে আছি খালি আমরা

কটি প্রাণী, স্থির হয়ে আছি একখানি উপুড় করা সরার পিঠে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রত্যাক্ষা করছি, আর একখানা উপুড় করা সরা নেমে আসছে আমাদের মাথার ওপর। দুই সরার মাঝে পড়ে পিষে যাব। নিরিবিলিতে-পেষণ কর্মটি সুসম্পন্ন হয়ে যাবে, এক প্রাণী সাক্ষী থাকবে না।

হ্যাঁ সাক্ষী থাকবেন আমাদের কাপ্তেন সাহেব। উনি ঠিক ফাঁকি দিয়ে পালাবেন। সেই ব্যবস্থা করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগে গেলেন ভদ্রলোক। বড় বড় তেরপল বার করে নৌকার খোলের মুখে চাপা দিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে ফেললেন। খোলের মধ্যে বালি, বালির ভেতর খাবার জলের কলসিগুলোকে গলা পর্যন্ত গেড়ে দেওয়া হল। কলসির মুখ বন্ধ করা হল কাপড়ের পুঁটলি বেঁধে। তার পর নৌকোর খোলের মুখে পড়ল তেরপল, ঢুকুক এখন নোনা জল কেমন করে ঢুকবে।

খাবার জল সামলানো হয়ে গেল। যারা সেই জল খাবে তাদেরও সামলানো প্রয়োজন। অতএব হুকুম হল, জ্যান্ত মালকটিকে খাঁচার ভেতর গিয়ে সেঁধুতে হবে।

খাঁচাটি হল নৌকার লেজের ডগায়, যার ছাতের ওপর জমশেদ সাহেবের মাচা। জমশেদ মাচায় বসে হাল ধরে আছেন, মাচার সামনে বসে আমি তাঁর পুব দেশের কন্যের কাহিনী শুনছি। নৌকাখানির দুপাশের দুই পাড় ক্রমে উঁচু হয়ে উঠে লেজের ডগায় মিশে গেছে। যেখানে মিশেছে তার খানিকটা সামনে খুব শক্ত এক কাঠের দেওয়াল দিয়ে দিব্যি একখানি তিন কোণা ঘর তৈরী হয়েছে। সেটি হল নৌকার

ভাঁড়ার ঘর। আমাদের দ্রব্যসামগ্রীও সেই ঘরে জমা হয়েছে। ঘরখানিতে ঢোকা বেরনোর ব্যবস্থাটি চমৎকার। ওঁদের মানে নৌকার মালিকদের অনেকবার সেই ঘরে ঢুকতে বেরতে দেখেছি। দেখে আমার সেই ছোটবেলাকার গিনিপিগ্-তুটোকে মনে পড়ে গিয়েছিল। কপির পাতা খাওয়াবার জন্যে ছোট বেলায় তুটো গিনিপিগ্ পুষেছিলাম! গিনিপিগ্দের ঘর চাই। পাড়ার মনিহারী দোকানটির মালিক ছিলেন মস্তর সেজমামা। মস্ত মামার দোকান থেকে একটা কাঠের বাক্স এনে দিলে। বাক্সটায় সাবান তেল বা ঐ জাতীয় কিছু এসেছিল। এক বিঘত চওড়া আধ বিঘত উঁচু একটি ফাঁক কাটা হল সেই বাক্সর গায়ে। তৈরী হয়ে গেল গিনিপিগ্দের যাওয়া আসার দরজা। বন্ধ করতে হলে একখানি থান ইঁট দরজায় সামনে খাড়া করে দিতাম।

সেই গিনিপিগদের মত ব্যবস্থা। ছোট্ট ঘরখানির দরজাটুকু এত ছোট যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে বেরতে হয়। দরজার সামনেই ছাতে ওঠবার সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশ দিয়ে গলে গিয়ে তবে সেই ফোকরের মুখে সেঁধুতে হবে। সেই ফোকরের মুখ বন্ধ করলে ঘরখানি একেবারে নিশ্ছিদ্র হয়ে গেল। হাওয়া বাতাস যাওয়া আসার জন্যে কোথায় নাকি এমন ব্যবস্থা করা আছে, যার ভেতর দিয়ে হাওয়াই শুধু চলতে পারে, জল কিছুতেই ঢুকতে পারে না। সেই খাঁচায় আমাদের ঢুকতে হবে। তার পর দেবে সেই ফোকরের মুখ বন্ধ করে। বোঝ ব্যবস্থাটা!

ভৈরবী কোথায় আছেন কে জানে। হয়তো ইতিমধ্যেই তাঁকে ঢোকান হয়ে গেছে খাঁচায়। আমি ধরে পড়লাম জমৃশেদ সাহেবকে। দোহাই মিঞা সাহেব, ঐ খাঁচার খপ্পর থেকে রক্ষে কর।

কোনও কিছু বলবার বা বোঝাবার সময় আছে নাকি তখন।

জম্‌শেদ সংক্ষেপে আবেদনটি নাকচ করে দিলেন। উঁহু, তা কি করে হয়। তোমাদের জানের জন্যে আমরা জিম্মাদার। ঢেউয়ের ঝাপটায় দরিয়ায় চলে গেলে গুণাগার দেবে কে?

কে চাইতে আসবে খেসারত আমাদের জন্যে? একদম বেফয়দা বেদস্তুর বেওয়ারিস মাল আমরা। কে আমাদের হিসেব রাখছে?'

কিছুই আর বলতে হল না। জম্‌শেদ সাহেব আচম্বিতে ডান ধারে হেলে পড়লেন। মড়মড় করে উঠল হালখানা, ওধার থেকে সব কজন মানুষ এক সুরে কি যেন বলে উঠল। প্রচণ্ড জোরে ভূমিকম্প হল যেন, বিষম এক ধাক্কা লাগল নৌকার তলায়। পড়লাম মুখ থুবড়ে, পড়েই উঠলাম। দাঁড়াতে হল না আর, মাচার কিনারটা ত্বহাতে খামচে ধরে কোনও রকমে টিকে রইলাম সেখানেই। মাচার ওপর জম্‌শেদ সাহেব তখন হালের মাথা ধরে একদম শুয়ে পড়েছেন।

তার পর কি হয়েছিল, এত দিন পরে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে বসেছি। হায় লেখা! কাগজের ওপর কালির আঁচড় কেটে বোঝাতে হবে, তার পর কি হয়েছিল। সমুদ্রের বুকে সেই নিবিড় অন্ধকারে—আচম্বিতে লক্ষ কোটি রুপোলী তারার ফুল ফুটে যে ভাষায় যে লেখা লিখেছিল সেই রাতে, সেই ভাষা তো মানুষের ভাষা না। অনেক বার চোখ মেলে তাকিয়েছিলাম সেই লেখার পানে, অনেকবার চোখ বুজে ফেলেছিলাম। ভয়ে নয়, আতঙ্কেও নয়, স্রেফ ক্ষুদ্রতার জন্যে। মানুষ ছোট, খুব ছোট। অত ছোট মানুষ অতবড় বিস্ময়ের পানে কি করে নির্লজ্জের মত তাকিয়ে থাকতে পারে।

বেশ করে মনে করবার চেষ্টা করছি, তার পর কি হয়েছিল, কি

দেখেছিলাম। কেমন যেন ধোঁকা লাগছে। যা দেখেছিলাম তা বোধ হয় মনের নজর দিয়েই দেখেছিলাম! সেটা কি দিন ছিল তখন। না রাত ছিল। দিন না হলে অত আলো এল কোথা থেকে! যতবার চোখ মেলে তাকাতে পেরেছি দেখছি, চতুর্দিক আলোয় আলো। কোথাও এতটুকু আঁধার দেখেছিলাম বলে মনে করতে পারছি না।

আলো, রুপোলী রোশনাই। মুণ্ডটার চতুর্দিকে চার জোড়া চক্ষু নেই, কাজেই মুণ্ডটাকে চারিদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে হয়েছে। যে দিকেই তাকিয়েছি, দেখেছি আকাশ ছোঁয়া বিশাল এক পাহাড়। পাহাড়টার মাথায় এধার থেকে ওধার পর্যন্ত রুপোলী রোশনাই। লক্ষ কোটি রুপোলী রঙ্‌মশাল উঁচিয়ে লক্ষ কোটি সৈন্য তেড়ে আসছে পাহাড়টার আড়ালে। পাহাড়টাও এগিয়ে আসছে হুড়মুড় করে। যতখানি লম্বা পাহাড়, যতখানি লম্বা পাহাড়ের মাথাটা, ততখানি শুধু রুপোলী ফুলে সাদা হয়ে আছে। সহস্র লক্ষ রুপোলা ফুল ফুটে উঠছে চারিদিকে। দুটো মাত্র চোখ দিয়ে তার কতটুকুই বা দেখা যায়।

দস্তুর মত অবরুদ্ধ অবস্থা, আগেকার দিনে রাজা-রাজড়ারা বেকায়দায় পড়ে যে দশা প্রাপ্ত হতেন সেই দশা। নেহাত গোবেচারা গুটিকতক যাত্রী আর কয়েকজন মাঝি-মাল্লাকে পিষে মারবার জন্যে বিশাল আয়োজন কে করেছিলেন কেন করেছিলেন বলতে পারব না। কিন্তু কোনও আয়োজনই কোনও কাজে লাগল না। অদ্ভুত এক ভেল্কিবাজির খেল্ চলতে লাগল। এই দেখছি, তেড়ে আসছে একটা পাহাড়, নির্ঘাত আছড়ে পড়বে নৌকার ওপর। এসে পড়েছে একদম পাশে। নিজে থেকে চোখ বুজে গেল, দম বন্ধ হয়ে গেল, পরমুহূর্তেই চোখ মেলে দেখলাম পাহাড়টা গুঁড়িয়ে পড়ল নৌকার পাশে। আর

একটা ঠিক সেই রকমের পাহাড় আবার তেড়ে আসছে। আর এক দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি আর একটা পাহাড় এধারেও এসে পড়েছে।

ঘুলিয়ে গিয়েছিল সবই। আদ্যোপান্ত আকাশখানা আর আকাশছোঁয়া সমুদ্রটা বেমালুম গায়েব হয়ে গিয়েছিল ছোট্ট একটু জায়গায়, গভীর গাড্ডায় পড়ে নৌকাখানা চরকির পাক খেতে লাগল। সময় আর সীমা দুই-ই হারিয়ে গেল। তার পর যা সম্বল রইল, সেটাকে ঠিক হুঁশ বলা যায় না। জেগেও রইলাম, দেখলামও সব কিছু। কিন্তু দ্রষ্টা হিসেবে কিছুই দেখলাম না। সেই অতি বিশাল অতি ভয়ঙ্কর অতি আশ্চর্য দ্রষ্টব্যের দ্রষ্টা রক্ত-মাংসের পিঁজরের মধ্যে থাকে না।

তবু সবই দেখলাম, সবই করলাম। হঠাৎ কানে গেল এক হাঁকাড়। সেই তুলকালাম কাণ্ড তলিয়ে গেল সেই হাঁকাড়ের তলায়। দেখলাম, যম-সদৃশ এক অন্ধকার মূর্তি হাল ধরে দাঁড়িয়েছেন। তৎক্ষণাৎ জম্‌শেদ সাহেব ঝাঁপিয়ে পড়লেন মাচার ওপর থেকে। পড়লেন একেবারে আমার ঘাড়ের ওপর। পড়েই খামচে ধরলেন আমার হাত একখানা। তার পর আর এক লাফে নীচে পাটাতনের ওপর। হেঁচকার চোটে আমিও পড়লাম তাঁর সঙ্গে। পর মুহূর্তেই টের পেলাম দুমুঠোর মধ্যে একগাছা মোটা দড়ি ধরে আছি প্রাণপণে আর ঝুলছি। দস্তুরমত ঝুলছি, পা দুখানা কোনও কিছুতেই ঠেকছে না। হাত দুখানা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হল। হোক্, তবু মুঠো আলগা করা হবে না কিছুতেই। মুঠো থেকে দড়ি ফসকালেই একদম উড়ে যাব রুপোলী মাথা পাহাড়ের চূড়ায়।

মরণ কামড়ে দড়ি গাছা হাতের মুঠোয় কামড়ে ধরে বোঝবার চেষ্টা

করলাম ব্যাপারটা কি ঘটেছে। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড একখানা পাল উঠে গেছে মাস্তুলের আগায়। পালের ওপর দিক আটকে থাকে আড়াআড়ি একখানা বাঁশের সঙ্গে। নাচের দিকে এ কোণ থেকে ও কোণ পর্যন্ত এক গাছা দড়ি—পালের কিনারায় সেলাই করা থাকে। সেই দড়িগাছা ধরে পাশাপাশি দশ বারো জন মানুষ আমরা ঝুলছি। উদ্দেশ্য, পালের নীচে ভার দেওয়া। নীচের দু কোণ নৌকার পাড়ের সঙ্গে বাঁধা আছে। মাঝখানে ভার পড়া চাই। নীচের দিকটা যদি অনেক উঁচুতে উঠে পড়ে তা হলে নৌকার ডগা আকাশে উঠে যাবে। হালের দিকটা চলে যাবে জলের তলায়। নৌকাখানা সোজা ঊর্ধ্বমুখ করে সিধে অতলে তলিয়ে যাবে।

সে সমস্ত কুকাণ্ড হবার জো কোথায়! কাপ্তেন সাহেবের হাঁকাড় শোনা যাচ্ছে! নৌকার চক্কর দেওয়া রহিত হল। তার পরই টের পেলাম, উড়ে চলেছি। অপরিসীম বেগে সীমা ডিঙিয়ে সময় মাড়িয়ে আমাদের নৌকা ছুটে চলেছে। অবরোধ অবধ্বস্ত হয়ে গেছে।

সেই অবরুদ্ধ অবস্থায় চরকির মত পাক খাওয়া, তার পর সেই পালের দড়ি ধরে শূন্যে ঠাং দুখানা তুলে দোল খাওয়া সেই মজার সময়টুকু কতখানি? সব সুদ্ধ কতটা সময় লেগেছিল অমন লড়াইটি ফতে হতে? জবাব দেওয়া কঠিন, সত্যিই সঠিক জবাব দেবার শক্তি নেই আমার। মনে হয়েছিল অনন্তকাল, যতকাল ধরে কাল তৈরী হয়েছে, পাক খাচ্ছি। যত কাল পর্যন্ত কাল বেঁচে থাকবে, দড়ি ধরে ঝুলব। তার পর হঠাৎ মনে হল যে হুড়হুড় করে জল ঢালা হচ্ছে নৌকাখানার ওপর। সেই ঝুলন্ত অবস্থাতেই ওপর দিকে মুখ তুলে

তাকিয়ে দেখলাম পালের পেট চুপসে এসেছে। তার পর পাটাতনের ওপর চরণ দুখানা ঘষড়াতে লাগল। দু-একবার ঘষড়াবার পরেই পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারলাম। হাতের দড়ি কিন্তু হাতের মুঠোতেই রইল। মুঠো কি সহজে ফসকায়, কামড়ের মত কামড়—যার নাম মরণ-কামড়। হাত দুখানা তাদের ধর্ম যথাযথ পালন করলে।

তাই নাকি করে। একবার এক ডাক্তারের কাছে শুনেছিলাম, মানুষের হাত দুখানা নাকি চরম মুহূর্তে কিছুতেই নিমকহারামি করে না। করে না বলেই সর্বাগ্রে হাত দুখানাই ভেঙে চুরমার হয়। কেউ যখন ওপর থেকে নীচের দিকে পড়তে থাকে, তখন তার মুণ্ডটা চলে আসে তলায়। সেই অবস্থায় দুখানা হাত লম্বা হয়ে মেলে যায়। মুখ আর মুণ্ডটাকে বাঁচাবার জন্যে হাত দুখানা মোক্ষম চেষ্টা করে। একেবারে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, আপ্‌সে-আপ তারা তাদের ধর্ম পালন করার চেষ্টা করবেই। সেই জন্যেই দেখা যায়, একতলা দোতলার ছাদ থেকে পড়া মানুষের মুখ মাথা রক্ষা পেলেও হাত দুখানা বাঁচে নি। সে বেচারারা তাদের ধর্ম পালন করতে গিয়ে গোল্লায় গেছে।

এই জাতের একটা কথা আমার এক পকেটমার বন্ধুও বলেছিল। বলেছিল, পকেট কাটা কর্মটি অনেক সময় সে নাকি ইচ্ছে করে করেই না। হাটে গেছে, বিস্তর মানুষ গুঁতোগুঁতি করছে হাটে, আমার বন্ধুটিও করছে। সকলেরই উদ্দেশ্য, কলাটা মুলোটা সস্তায় কিনে আনা। আমার বন্ধুর যা কেনাকাটার তা যদি ভালয় ভালয় আগেই কেনা হয়ে গেল, তা হলে তো হাত দুখানা গেল জুড়ে! গাঁটের কড়ি খরচা করে যে মাল কেনা হল, তাই রয়েছে হাতে। সেগুলো ফেলে দিয়ে তো আর হাত দুখানা অন্য কোনও কর্মে ব্যাপৃত হতে পারে না।

কিন্তু রেওয়াজ হচ্ছে হাটে গিয়ে পাঁচটা জিনিস দেখে শুনে তবে কেনা-কাটা শুরু হয়। ঐ দেখা শোনা করতে গেলেই হাটেতে পাক মারতে হয়। পাক মারতে মারতে ঘটল বিপদ। নজরে পড়ে গেল, হাওয়া-খাওয়া বাবুটি এসেছেন হাটে। চালচলন দেখে গায়ে বিষ ছড়িয়ে দিলে। লোকটা মনে করেছে কি! এটা হাট না হাওয়া-খাওয়ার মাঠ। নবাব তেজচন্দ্র যেন। টাকা যেন খোলামকুচি! অমনভাবে টাকা পকেটে নিয়ে কোন জরদ্গব হাটে ঘোরে। এই রকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ওধারে হাত হাতের ধর্ম পালন করে ফেললে। বন্ধুটি আমার করে কি তখন। এক হাতে নিয়ে আর এক হাতে ফিরিয়ে দিতে গেলেও বিপদ। পাইকারী প্রহার কিছুতে এড়ানো যাবে না।

ঐ হাতের জন্যে অনেক সময় পাইকারী প্রহার খেতেও হয়। মুখ রক্ষাও করে তখন ঐ হাত দুখানাই। ধরা পড়া মাত্র দুহাত কুণ্ডলী পাকিয়ে যায়। মুখখানা গেড়ে যায় সেই কুণ্ডলীর মাঝখানে। কিল চড় জুতো যা পড়বার সব পড়ে পিঠের ওপর। মুখখানি বড় একটা চোট পায় না।

মুখ রক্ষা করে হাত, জান বাঁচায় হাত, কিন্তু মান বাঁচায় কি! প্রাণপণে পালের দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করতে করতে জানের চেয়ে মানের দামটা বেশী বলে মনে হল। ঝড়টা তখন সমান তালে চলছে, দড়ি ছাড়লেই উড়ে চলে যাব সাগর জলে। 'সাগর জলে সিনান করি সজল এলো চুলে' কবিতাটি স্মরণে উদয় হল না তখন। উদয় হল ভৈরবীর চিন্তা। ইয়া অনন্তদেব! গেল কোথায় মানুষটা। ঠিক সময় খাঁচায় ঢুকতে পেরেছে তো! যদি না পেরে থাকে! বেঁচে ফিরে গিয়ে তা হলে আমি মুখ দেখাব কেমন করে। একে স্ত্রীলোক

এবং তার ওপর অবলা, অবলাকে রক্ষা করার জন্যে সঙ্গে আছি। রক্ষা যদি না পেয়ে থাকেন তিনি তা হলে আমার মুখটা থাকে কোথায় !

দড়ি ছেড়ে খুঁজে দেখব সে জোটি নেই তখন। কি মুশকিলেই যে পড়লাম। তখন বলিই বা কি কাকে, শোনেই বা কে। প্রায় কেঁদে ফেলার মত অবস্থা হল। ওধারে মুশকিল-আসান কাপ্তেন সাহেবের মুখ থেকে অনবরত হাঁকাড় শোনা যাচ্ছে। যখন যা হুকুম হচ্ছে, তখনই সেটি পালন করা হচ্ছে। আরও দুখানা খুচরো পাল মাস্তুলের ডগায় উঠে গেল। সেই প্রচণ্ড ঝড়-জলের মধ্যেই ওলট-পালট খাচ্ছে মানুষ-গুলো, কিন্তু যার যা কর্ম ঠিক করে যাচ্ছে। আমরা জনা চার পাঁচ তখনও ধরে আছি সেই বড় পালখানাকে। বাকী সবাই পাটাতনের ওপর দৌড় ঝাঁপ করছে নির্বিঘ্নে। হঠাৎ কাপ্তেন সাহেব হুকুম করলেন, জলদি মিঠে পানির পিপের মুখ খুলে দাও। বৃষ্টির জল ভরে নাও।

পিচ মাখানো মস্ত এক পিপে পাটাতনের সঙ্গে সেঁটে বসে আছে নৌকার নাকের ডগায়। ছুটে গেল একজন সেখানে। গিয়েই বিকট এক আর্তনাদ। সঙ্গে সঙ্গে আরও দুজন দৌড়ল। ভেতর থেকে টেনে তুললে তারা একটা মানুষকে। মানুষটা গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে পরম নিশ্চিন্তে পিপের ভেতর অবস্থান করছিল। ঝড় জল বৃষ্টি বিদ্যুৎ কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে নি।

বলার আর কারও কিছুই রইল না। থ হয়ে গেলেন স্বয়ং কাপ্তেন সাহেব পর্যন্ত। এ আবার কোন কিসিমের আওরত রে বাবা ! আওরত হল জাতে অবলা, এমন সাংঘাতিক জাতের অবলা আওরত কে কোথায় দেখেছে।

জম্‌শেদ সাহেব দেখেছেন। জম্‌শেদ জানেন, আওরত কি চিজ। কখন যে কি মর্জি হবে আওরতের, তা নাকি দেবতারাও বুঝতে পারেন না। দেবতারা যেখানে নাকানি চোপানি খান, মানুষ তো সেখানে কোন ছার। তবু ছারকপালে মানুষ আওরতের পাল্লায় পড়বেই, পড়ে ছারখার হয়ে যাবেই। পরদিন সকালে ছারখার হয়ে যাওয়া সাগরের বুকে ভাসতে ভাসতে জম্‌শেদ সাহেবের সেই পুব দেশের কন্যের শক্তির পরিচয় পেলাম। সেই কন্যে জমশেদের মুঠোর মধ্যে ধরা দিলে। ধরা যখন দিলে তখন জম্‌শেদ বিলকুল হুঁশ হারিয়ে ফেললেন। হুঁশ কেড়ে নেওয়ার শক্তি ছিল সেই কন্যের, জম্‌শেদ যেন একটা তুফানের মধ্যে পড়ে গেলেন।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন জম্‌শেদ সাহেব। বললেন—সে ছিল সত্যিকারের আওরত। আওরতের শরীর হলেই কি আওরত হয়, আওরত হবে ঐ দরিয়ার তুফানের মত। সত্যিকারের আওরত ঐ তুফানের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়ে। যখন পড়ে, তখন দম বন্ধ হয়ে যায়, চোখ আঁধার হয়ে ওঠে, আর একটা নেশা লাগে খুনে। এমন নেশাই লাগে যে তখন পাঁজরার মধ্যে ছোরাছুরি চালিয়ে দিলেও বিলকুল মালুম হয় না। ঐ যে তুফানের সঙ্গে আমরা লড়লাম, তখন কি একটুও হুঁশ ছিল আমাদের। লড়াই, স্রেফ লড়াই, মরা বাঁচার কথা মোটে খেয়ালেই আসে না। তুফান চায় ঘাড়ে চাপতে, তুফানের ঘাড়ে চেপে বসতে হবে। তুফানকে চিরে ফেঁড়ে এধার থেকে ওধার দেখে নিতে হবে। আওরতও তাই, তাকে চিরে তার ভেতরে কি আছে জানতে হবে। তার—

তার পর সেই পুব দেশের কন্যের মধ্যে কন্যেটি কোথায় লুকিয়ে

আছে, তাই খোঁজ করার জন্যে কি কি করেছিলেন তার সবিস্তার বর্ণনা দিতে লাগলেন জমশেদ সাহেব। সে কাহিনী সাগরের বুকে বসে শোনা যায়, বলাও যায়। ডাঙ্গায় একদম অচল। ডাঙ্গায় বসে কোনও কন্যের কাঁধ থেকে কোমর বা কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থানটুকুর সঙ্গে দরিয়ার তুফানের তুলনা দিতে গেলে ডাঙার মানুষের মনে সে কাঁটার মত বিঁধবে। কারণ—কারণ হল, ডাঙ্গায় মানুষের মনে কখনও তুফান জাগে না। ডাঙ্গার জীব ডাঙ্গায় বাস করে বলে ডোববার ভয় তার খুব বেশী। দরিয়ার বুকে যারা ভাসে, তাদের ও বালাই নেই। দরিয়া তাদের দিলগুলোকে দরিয়ার মত করে ছেড়ে দেয়। দিলের মধ্যে এতটুকু কারচুপি লুকিয়ে থাকলে কি আর দিলদরিয়া হওয়া যায়।

আওরত কিন্তু দরিয়া নয়, আওরত হল ইঁদারা। দরিয়ার বুকে ঝড় তুফান ওঠে, ইঁদারায় ও সব হাঙ্গামা নেই। দরিয়ায় মরীয়া হয়ে তুফানের সঙ্গে লড়াই করার কায়দা পাওয়া যায়, ইঁদারায় পড়লে স্রেফ তলিয়ে যাও। হাত পা নাড়বার জো আছে যে ভাসবে। তলিয়েই গিয়েছিলেন জমশেদ মিঞা। সেই পুব দেশের কন্যের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে মণি-মুক্তো খুঁজে মরছিলেন তিনি। এধারে তাঁর সর্বস্ব খোয়া গেল। জমশেদ বললেন—আমি আমার দিলখানাকে উপড়ে দিয়ে ফেলেছি তাকে। দিয়ে তার দিল পাবার চেষ্টা করেছি। সে আমায় কিছুই দেয় নি, আমি তার কিছুই জানতে পারি নি। সে আমার কাছে একদম অচেনা থেকে গেছে।

কোনও রকমে এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম—গেল কি করে?

স্রেফ বিক্রী করে দিলে তার বাপ। রিহান্ খাতুমের বাপ ফরিদুদ্দিন মেয়েটাকে বিক্রী করার জন্যে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিল। মেয়ে যেই বিক্রী হবার উপযুক্ত হয়ে উঠল, তখন খদ্দের এসে জুটে গেল শয়তানের তৈরী বেহস্ত থেকে। ফরিদুদ্দিন কন্যেটিকে বিক্রী করে দিয়ে টাকা-কড়ি নিয়ে গা ঢাকা দিলেন।

আরও প্রশ্ন করা শালীনতা-বিরুদ্ধ। তবে দরিয়ায় অত শালীনতার বালাই নেই। তাই আবার জিজ্ঞাসা করে ফেললাম— বাধা দিলেন না কেন? আমি হলে সেই খদ্দেরের সঙ্গে মরীয়া হয়ে লড়তাম।

সুযোগ পেলে তো। জম্‌শেদ সে সুযোগই পান নি। কচ্ছের কূলে জম্‌শেদের সমাজে আশনাই ভারী বেইজ্জতি ব্যাপার। আওরত সেখানেও আছে, তবে আছে ঐ বকরী ফকরীর মত। মরদে শাদি করে, ছেলে পুলে হয়, মরদটার জন্যে খাটতে খাটতে জেনানাটা মরে যায়। আর মরদটা যদি আগে মরে দরিয়ায় ডুবে তা হলে জেনানাটা ছেলে পুলে নিয়ে আর একটা মরদের ঘরে ওঠে! আবার খাটে আবার ছেলে পুলে হয়। আশনাই করার মত আওরত নেই সেখানে, জেনানা সব জেনানা। জেনানার সঙ্গে কি আশনাই করা চলে।

সেই আওরত বিহীন জেনানা মহলে জন্মে জম্‌শেদ পুব দেশের কন্যের কাছে দিল হারিয়ে ফেললেন। ফেললেও ব্যাপারটা সবায়ের কাছে লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল। ভাবতেও পারেন নি যে বিপদটা কোন দিক দিয়ে আসবে। তাই পরম নিশ্চিন্তে আশনাই চালাতে চালাতে পরম নিশ্চিন্তে দরিয়ায় সফর কামাতে গেলেন। জানেনই তো পুব দেশের কন্যে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে। যাবে কোথায় সে, কার কাছে

যাবে। একমাত্র জম্‌শেদই জানেন তার আসল পরিচয়, আর কেউ জানে না। ভুলেই গিয়েছিলেন যে মেয়ের বাপ মেয়ের পরিচয় তাঁর চেয়ে ভাল করে জানে।

জানে বলেই বাপ মেয়ে নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। জম্‌শেদ গেলেন সফর কামাতে, ওধারে সুযোগ এসে কচ্ছের কূলে ভিড়ে গেল। মস্ত এক নৌকা নিয়ে মালাবারের এক মাতব্বর নাবিক উপস্থিত হল জম্‌শেদের গাঁয়ে। লোকটার অনেক টাকা, অনেক নৌকা, খুব বড় সওদাগর। টাকা ঢেলে দিয়ে জম্‌শেদের গাঁয়ের সব কটা মানুষকে খাটাতে পারে সে। অতবড় মানুষটাকে সবাই খাতির যত্ন করতে বাধ্য। কয়েক দিন সে নৌকা লাগিয়ে রইল কচ্ছের কূলে, খুব খানাপিনা হল। বিস্তর টাকা পয়সা খরচা করলে। তার পর যাবার সময় ফরিদুদ্দিন আর তার মেয়েকে নিয়ে চলে গেল।

সেই থেকে জম্‌শেদ সাহেব তাকে খুঁজে ফিরছেন। করাচী থেকে কুমারিকা আর ওধারে মাদ্রাজ কলকাতা আর রেঙ্গুন, সব ঘাটে ঘাটে বার বার খুঁজে ফিরছেন তাঁর দুশমনকে জম্‌শেদ সাহেব। সময়ের পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে খুঁজতে খুঁজতে, কিন্তু ব্যাপারটার এসপার ওসপার কিছুতে হল না।

সেই মাতব্বর নাবিকের দেশ মালাবারে খুঁজেছিলেন?

হাঁ, সেখানেও গেছি। তার ঘর বাড়ি কয়েক গণ্ডা জেনানা ছেলে পুলে সব পড়ে আছে সেখানে। কিন্তু সে মানুষটা আর ফেরে নি।

তা হলে বোধ হয় সেবারেই তার নৌকা দরিয়ায় মার খেয়েছে।

জম্‌শেদ দরিয়ার পানির পানে বহুক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়লেন। বললেন—না, কিছুতেই তা হতে পারে না। এই

দরিয়াকে আমি চিনি। দরিয়া আমার সঙ্গে কিছুতেই অতবড় বেইমানি করতে পারে না, কিছুতেই না।

আমিও দরিয়ার পানে তাকিয়ে রইলাম। কে বলে দেবে, দিলদরিয়া দরিয়া কেন অমন ফুলে ফুলে ওঠে কে বলে দেবে!

॥ ছয় ॥

দিলের সংবাদ কেবা কার রাখে!

খুব বেশী রকম দিল জানাজানি হওয়াটা আবার উল্টে আপদ বাধায়। ভূত প্রেত আকাশ মানুষ দরিয়া যার সঙ্গে দিলখোলা পরিচয় হবে, তার রঙ তৎক্ষণাৎ ফিকে হয়ে গেল। তখন আর কোনও রকমের সঙ্কোচ নেই, ঘুচে গেল সন্দেহ সমীহ করা। দাঁড়াল একটা মস্করা করার উপযুক্ত ম্যাড়মেড়ে সম্বন্ধ। তখন শুধু মুখ বাঁকানো আর ছুঁৎধরার পালা, দিলের তখন দাঁত বেরিয়ে পড়ে।

শ্রীকৈকেয়ীনন্দন মিশ্র মহারাজের দিল কিন্তু দেখা যেত। ওঁর দিলখানি ছিল ওর গোঁফজোড়াটির দুই প্রান্তে গিঁট দেওয়া। দরিয়ার দাগাবাজিতে গিঁট সুদ্ধ দিল উধাও হয়ে গেল। নিতান্ত দৈব-দুর্বিপাক বশতঃ ঘটল ব্যাপারটা, মিশিরজী কিন্তু সে জন্যে দরিয়াকে দায়ী করলেন। খামকা অমন খেপে না উঠত যদি দরিয়া, তাহলে মিশিরজীকে খাঁচায় ঢুকতে হত না। বাণ্ডিল বাঁধা শুঁটকী মাছ ছিল খাঁচার মধ্যে, শুঁটকী মাছ অতি দুর্দান্ত জানোয়ার। মাছ যতক্ষণ শুঁটকী না হয়, ততক্ষণ কামড়ায় কাঁটা ফুটিয়ে দেয় বা ল্যাজের ঝাপটা মারে। ও সব

শারীরিক যন্ত্রণা সইতে পারলে সওয়া যায়। কিন্তু জলের মাছ ডাঙায় পৌঁছে একটিবার শুঁটকীর জাতে উঠলে তখন তার ধারে কাছে যাওয়াই মুশকিল। শ্বাসে প্রশ্বাসে মর্মে আঘাত হানার শক্তি হয়েছে তার তখন, শ্বাস নিতে গেলে সে আঘাত নিতেই হবে মর্মের মধ্যে, কিছুতেই পরিত্রাণ নেই।

শুঁটকী মাছ মিশিরজীর সঙ্গে মস্করা করে বসল। তাদের সঙ্গে এক খাঁচায় বন্দী হওয়ার দরুন মিশিরজীর মুল্যটা কমে গেল। অন্ধকারে কি ভাবে কি ঘটল, মিশিরজী মোটে বাতলাতেই পারলেন না। বেকায়দায় পড়ে গিয়ে বেমক্কা বমি শুরু হয় তাঁর, বেসামাল হয়ে ঘাড় মুখ গুঁজড়ে পড়েন। তার পর টের পান যে গিঁট বাঁধা গোঁফে বিষম টান পড়েছে। গোঁফের সঙ্গে মুণ্ডটাও বাঁধা পড়েছে এক অদৃশ্য শত্রুর হাতে। হেঁচকা হেঁচকি টানাটানির চোটে মুণ্ডটাকে যখন খালাস করে আনেন, তখন ঠোঁটে হাত দিয়ে দেখেন—

দেখবেন আর কি! গোঁফের বদলে মুড়ো ঝাঁটা, মুড়ো ঝাঁটার ডগায় হাত ঠেকলে কার মেজাজ ঠিক থাকে।

বেখাপ্পা বেঁড়ে বদন থেকে অতি বদখৎ বাত সব বেরতে লাগল। দরিয়ার বরাত ভাল যে তার কান নেই। থাকলে নিশ্চয়ই কান দুখানি রাতুল হয়ে উঠত। জেলের জবান জলেও আগুন জ্বালাতে পারে।

একজন খালাসী ভাঁড়ার ঘর থেকে শুঁটকী মাছগুলো বার করে ঘরখানা ধোয়ার ব্যবস্থা করছিল। এক বাণ্ডিল মাছের এক ধারে আটকে রয়েছে মিশিরজীর গোঁফ। যত্ন করে সেই গোঁফ ছাড়ালে সেখান থেকে খালাসী ছোকরা, ছাড়িয়ে মিশিরজীকে প্রত্যর্পণ করতে

গেল। কে নেয়! মিশিরজা এক টানে তাঁর দিল সুদ্ধ গোঁফ দরিয়ার বুকে নিক্ষেপ করলেন। করে দিল-খোলসা খেউড় গাইতে লাগলেন।

একটু আধটু জখম সকলেই হয়েছেন। তবে দিলে চোট পেয়েছেন কেবল মাত্র মিশিরজী মহারাজ। পরমানন্দজীকে দেখে মনে হল, বড্ড বেশী রকম ঝাঁকুনি খেয়েছেন যেন। ফলে ওঁর অভ্যন্তরে সেই পরম পদার্থ পারদ যেটুকু আছে, তা থেকে মহাজ্যোতিটা আর তেমন ভাবে ফুটে উঠছে না। বাইরে তেমন পরিবর্তন দেখা গেল না, শুধু কপালের ওপর ছোট খাট একটি কালোজাম গজিয়ে উঠেছে। বললেন,—দুই কুনুয়ের ছাল গেছে খানিকটা করে, জ্বালা করছে। ঐ ছোট ঘরে পুরে দরজা বন্ধ করলে বকরীও মরে যাবে, আমরা তো মানুষ। মানুষ বলেই গোঁফ ছাল চুলের ওপর দিয়ে কাটল ফাঁড়াটা। তা আপনারা দুজনে কেমন করে ঐ ঘরে ঢোকা থেকে পরিত্রাণ পেলেন?

দু হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললাম—তাও ঐ দরিয়া বাবার দয়ায়। প্রাণপক্ষীটিকে খাঁচাছাড়া করবার জন্যে খাঁচার মধ্যে ঢুকতেই হবে, এমন কোনও কথা নেই।

পরমানন্দজীর ভেতর মহাজ্যোতিটি আবার চাঙ্গা দিয়ে উঠল। জুতসই একখানি গান ধরে ফেললেন তৎক্ষণাৎ—

পঞ্ছী রে—
পঞ্ছী, কাহে হোত উদাস।
তু তোড় না মন কি আশ।
পঞ্ছী, কাহে হোত উদাস॥

অত্যাশ্চর্য কাণ্ড! হঠাৎ একটা ভোজবাজি লেগে গেল যেন। পাখী নই, ডানা নেই, উড়ে বেড়াবার উৎকট শখ কখনও উঁকি মারে নি মনের মধ্যে। তবু উড়লাম। কি যে ছিল পরমানন্দজীর কণ্ঠে, তা তিনিই জানেন। 'পঞ্ছী রে–' টানটি দেবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন হালকা হয়ে গেলাম। সসাগরা ধরণীর আকর্ষণের বাইরে পৌঁছে হাওয়ায় ভেসে চললাম অনন্তের পানে। পথ পরমানন্দজীর কণ্ঠের সুর। সুর দিয়ে অনন্ত পর্যন্ত পথ বেঁধে দিলেন পরমানন্দজী। ভাসতে লাগলাম সেই অনন্তের পথে আর শুনতে লাগলাম—

দেখ খাটায়ে আয়ি হায় উ
এক সন্দেশা লায়ি আয় উ
পিঁজরা লে কর, উড় যা পঞ্ছী
যা সাজন কে পাশ।
পঞ্ছী কাহে হোত উদাস॥

ঔদাস্য অভ্যাস করার জন্যে কত কি তপ জপ ধ্যান ধারণা করার প্রয়োজন হয় বলে শুনেছিলাম। সেই ঔদাস্যকে শুধু মাত্র গলার কসরতে এ ভাবে করায়ত্ত করা যায়, ছোঁয়াচে রোগের মত সেই ঔদাস্য অন্যের স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়া যায় এ সব কে জানত! দরিয়া গেল, নৌকা গেল, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কিছুই রইল না। এমন কি এক হাত সামনে বসা স্বয়ং পরমানন্দজীও উধাও হয়ে গেলেন। রইল শুধু সুর, সুর আর বাণী। পিঁজরাটায় আগুন লাগিয়ে দে, পাখাগুলো পুড়িয়ে ফেল, তোর ছাই বক হয়ে উড়ে পৌঁছে যাক তাঁর কাছে।

উঠ্ আউর উঠ্ কর
আগ্ লাগা দে

ফুক দে পিঁজরা
পঞ্ছ জ্বালা দে
রাখ বগুলা বন কর পঞ্ছী
পোঁছে উনকে পাশ।
পঞ্ছী কাহে হোত উদাস॥

অনেকক্ষণ উড়লাম মন-আকাশে, 'উনকে পাশ' পৌঁছতে না পারলেও এমন এক স্থানে পোঁছে গেলাম যেখানে পিঁজরা পৌঁছতে পারে না। কথার কথা বলে ফেলেছিলাম পরমানন্দজীকে, প্রাণ-পক্ষীকে খাঁচাছাড়া করাবার কথাটা নেহাত রসিকতা করেই বলে ফেলেছিলাম। পরমানন্দজী হাতে হাতে মালুম দিয়ে দিলেন। প্রাণ-পক্ষী খাঁচাছাড়া হয়ে উড়তে থাকলে আরামটা কেমন হয়, সত্ত সত্ত তা চোখে দেখলাম। বুঝলাম, ব্যাপারটা খুব হালকা হলেও নির্ভেজাল আমুদে ব্যাপার নয়। উড়তে যদি থাকে প্রাণপক্ষী অনন্ত শূন্যতা অবলম্বন করে, তা হলে দুঃখ বেদনা যেমন পেছনে পড়ে থাকে, আনন্দটাও তেমনি অকেজো হয়ে যায়। আনন্দ নিরানন্দের নাগালের বাইরে কোথাও যদি সেই 'উনকে' থাকেন, তা হলে 'উনকে পাশ' পোঁছলেই বা কি লাভ হবে! সুর তা সে যেমন সুরই হোক, শুধু সুর সম্বল করে কোন্ পঞ্ছী অনির্দিষ্টকাল উড়বে! পিঁজরা পোড়া ছাই বগুলা বনে উড়তে থাকলেও অনন্তকাল সেই বগুলা সুরের আকাশে ভাসতে পারে না।

অনিবার্য পতন রোধ করা গেল না। সুরের হাওয়া বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই কাঠের নৌকার কাঠের পাটাতনের ওপর সপিঁজরা আছাড় খেয়ে পড়লাম। চতুর্দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলাম একেবারে, এক

প্রাণী নেই নৌকার ওপর। ওপর দিকে মুখ তুলে দেখলাম, একখানি পালও নেই। আরও অনেক ওপরে আকাশের গায়ে ভুসো মাখিয়ে দিয়েছে কে। সেই ভুসোর ভেতর থেকে দুটি একটি হীরে মণিমুক্তো চিকচিক করছে।

ঠাওর করতে পারলাম না কতক্ষণ ঘুমিয়েছি। একটু সময় চোখ বুজে থেকে আবার চোখ মেলতেই চোখের আঁধার কেটে গেল। দেখলাম, যাত্রারা সবাই ঘুমিয়ে রয়েছেন। কাপড় চাপা দেওয়া যে বস্তুটি লম্বা হয়ে আছে আমার শিয়রের দিকে সে বস্তুটি ভৈরবী নিশ্চয়ই। কাপড়ের ভেতরে থেকে ঘোঁ ঘোঁৎ ঘুঁ এক ঘেয়ে শব্দ উঠছে। অমন বিদকুটে জাতের আওয়াজ মুখ ভরতি পান দোক্তার রস থাকলেই বেরয়। ভৈরবীর ওধারে এক গাদা কাছি কুণ্ডলা পাকিয়ে রয়েছে। তার ওধারে কম্বল তোশক বালিশ সাজানো তোফা শয্যা পেতে পার্শী বুড়ো বুড়ীকে নিয়ে শুয়েছেন। শ্রীকৈকেয়ীনন্দন মিশিরজী পাটাতনের ওপর থাকেন না। তাঁর স্থান খোলের মধ্যে বালির ওপর। নিশ্চয়ই তিনি সেখানে নিদ্রা দিচ্ছেন। পরমানন্দজী কোথায় শয্যা পাতেন, জানা নেই। দু রাত নৌকার ওপর কেটেছে। প্রথম রাতটা অজ্ঞান হয়ে ঘুমিয়ে, দ্বিতীয় রাতটা তুফানের সঙ্গে যুঝে। তৃতীয় রাত্তে জেগে উঠে সহযাত্রীদের খোঁজখবর নিতে গেলাম। গিয়ে একদম চক্ষুস্থির। আর মানুষ সব গেল কোথায়! যারা দড়ি দড়া ধরে দিন রাত অষ্ট প্রহর ঠায় জেগে বসে ছিল, তারা একদম গায়েব। হল কি রে বাপু!

ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরে। সেই সঙ্গে আর এক আপদ ঘটল। মনে হল, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। গত রাতের

তুফানের জের মেটাবার জন্যে সারা দিনটাই নৌকাওয়ালারা নৌকা-খানাকে ঘষেছে মেজেছে। সেই হুল্লোড়ের ভেতর রান্নার হাঙ্গামা না করে মেওয়া মিষ্টি খাওয়া হয়েছিল। ঠিক ছিল, সন্ধ্যার পরে রুটি তরকারি বানানো হবে। সন্ধ্যা নিশ্চয়ই ঠিক সন্ধ্যার সময় সমুপস্থিত হয়েছিল। হয়ে দেখেছিল, আমরা সবাই ঘুমোচ্ছি। এক টানা দশ বারো ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকলে গলা শুকিয়ে কাঠ হবেই। আগে জল খানিকটা গলায় ঢালা দরকার। এক লোটা জল ভৈরবী হাতের কাছে নিয়ে ঘুমোন। নজর করে দেখলাম, লোটাটি – উপুড় করা রয়েছে এক পাশে। অর্থাৎ ভৈরবীও আশা করেছিলেন, সন্ধ্যার পরে রুটি তরকারি বানানো এবং তা খাওয়া হবে। তার পর শোবার সময় এক লোটা জল হাতের কাছে রাখবেন। সবই ভণ্ডুল হয়ে গেছে ঘুমের দাপটে। সারা রাত তুফানের দাপট সহ্য করে ঘুমের দাপটকে ঠেকানো সহজ কথা নয়।

উঠে পড়লাম। নীচে খোলের মধ্যে বালির গাদায় বসানো আছে মিষ্টি জলের কলসী। আগে এক লোটা জল আনা যাক। তার পর নৌকাওয়ালাদের খোঁজে লাগা যাবে।

উঠে দাঁড়াতেই নজর পড়ল নৌকার লেজের ডগায়। সেই অনেক উঁচুতে ছোট ঘরখানির ছাতে ছোট্ট মাচাটির ওপর হালের মাথায় হাত রেখে স্থির হয়ে আছে এক অন্ধকার মূর্তি। জমশেদ্ সাহেব নিশ্চয়ই ঠিক জেগে আছেন। বাকা সবাই ঘুমিয়ে থাকলেও ওঁকে ঠিক জেগে থাকতে হবে। একলা বসে আছেন হালে। নিরম্বু একলা। কি ভয়ানক একলা ঐ মানুষটি, তা অন্য কেউ না জানলেও আমি জানি। হালে বসে দরিয়ার পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। কিবা আলো কিবা অন্ধকার, ঐ ভাবেই তাকিয়ে থাকবেন। আশায় আছেন, দরিয়া

একদিন ওঁকে বাতলে দেবে, কোথায় পালিয়ে গেল ওঁর পুব দেশের কন্যে।

ভুলে গেলাম তেষ্টা, পায়ে পায়ে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম ওপরে। কাছাকাছি পৌঁছে থামতে হল। এ কি! জম্‌শেদ্‌ মিঞা তো নয়!

সেই অন্ধকার মূর্তির ভেতর থেকে বাজখাঁই গলা বেরল—কাকে খুঁজছ? জম্‌শেদকে? তারা সবাই নেমে গেছে নৌকা থেকে, গুণ টানছে। তামাম রাতটা গুণ টেনে এগতে পারলে সকালে বারদরিয়ায় নামতে পারব। পানিটা হঠাৎ না বাড়লে হয়। পানি বাড়লে ওদের উঠে আসতে হবে নৌকায়। তা হলেই মুশকিল। বারদরিয়ায় পৌঁছতে সেই দুপুর হয়ে যাবে।

গুণ টানছে!

চারিদিকে তাকিয়ে শ্বাস ফেলতেও ভুলে গেলাম। সমুদ্রের ভেতর গুণ টেনে এগচ্ছে কেমন করে! গুণ টেনে নৌকা নিয়ে যেতে হলে পায়ের তলায় মাটি থাকা চাই। সাঁতরাতে সাঁতরাতে কি গুণ টানা যায়!

কোনও দিকে কিছুই নজরে পড়ল না। আকাশ ভুষো মাখানো, সমুদ্রটা যেন রেড়ির তেলের সমুদ্র, এতটুকু নড়ছে চড়ছে না। যারা রুপোলী ফুলঝুরি পুড়িয়ে সমুদ্রের বুকে-নেচে বেড়াত, তারা সবাই লুকিয়ে পড়েছে। আকাশে সমুদ্রে জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে রয়েছে যেন। কালঘুম, কালঘুমে গ্রাস করেছে বিশ্বচরাচর, কার সাধ্য সেই ঘুমন্ত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকবে!

ওরা কিন্তু ওই ঘুমন্ত সমুদ্রের বুকে গুণ টানছে। দেখা গেল না

তাদের, মাস্তুলের মাথায় বাঁধা পাঁচ সাত গাছা দড়ি দেখা গেল। দড়ি-গুলো মাস্তুলের মাথা থেকে সোজা নেমে গেছে সাগর-গর্ভে, নৌকার সামনে অনেক দূরে কোথাও গিয়ে জল ছুঁয়েছে দড়ির ডগাগুলো। সেখানে রয়েছে তারা, যারা নৌকার ওপর আমাদের সঙ্গে ছিল। তারাও মানুষ আমরাও মানুষ। তারা নেমে গেছে রেড়ির তেলের সমুদ্রে, নেমে নৌকা সুদ্ধ আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে।

সমুদ্রের পানে তাকিয়ে থাকা গেল না। চোখ বুজে নিজের পানে তাকাতে গিয়ে আরও বিপদে পড়ে গেলাম। সমুদ্রের চেয়ে বীভৎস দেখাল নিজের আসল মূর্তিটাকে। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়লাম। খুব সাবধানে দড়ি দড়া মানুষ মাল টপকে ডিঙিয়ে পেঁ ছিলাম নৌকার নাকের ডগায়। পেঁ ছে অনেকটা ঝুঁকে সমুদ্রের মধ্যে খুঁজতে লাগলাম তাদের। কোথায় কি, দড়িগুলো যে কত আগে গিয়ে জলে নেমেছে, তা মোটে আন্দাজ করতেই পারলাম না।

মগজ তেতে উঠল। ওরা আমাদের ঠাওরেছে কি !, নুলো খোঁড়া পঙ্গু না বকরা-বকরী আমরা, যে ওরা ওদের মর্জিমাফিক টেনে নিয়ে যাবে, আর আমরা ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকব ! দল বেঁধে নেমে গেল যখন নৌকা থেকে, তখন আমাদের জানিয়ে গেল না কেন ? আমরা সবাই কচি খোকা নাকি।

কামড়ে ধরলাম ঠোঁট; নিদারুণ আফসোসে দম আটকে এল। ওদের কাছে পেঁ ছতে পারলে ওদের বোঝানো যায় যে আমরাও মানুষ, নুলো হাবা পঙ্গু মানুষ নই। কিন্তু ওদের তখন নাগাল পাবার উপায় কি ! চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানেই, দাঁড়িয়ে দরদর করে ঘামতে লাগলাম।

হঠাৎ কি যেন একটা ছপাৎ করে পড়ল কাঁধের ওপর। আর একটু হলেই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আর কি, খুব সামলে গেলাম। তাকিয়ে ঠাওর করে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। মাঝে মাঝে এক একটা গুণে ঢিল পড়ছে, নামতে নামতে সেটা নৌকার ওপর এসে ঠেকছে। একটু পরেই আবার লাফিয়ে উঠেছে ওপরে, আবার পড়ছে দড়িতে টান, টানের চোটে নৌকা এগিয়ে চলেছে কি না বোঝা গেল না।

তাকিয়ে আছি দড়িগুলোর দিকে উর্ধ্ব মুখ করে। খানিক বাদে আর এক গাছা দড়িতে ঢিল পড়ল, নেমে এল প্রায় নাগালের মধ্যে, লাফিয়ে উঠে দু হাতে ধরে ফেললাম। ধরবার সঙ্গে সঙ্গে আবার পড়ল টান, উঠে গেলাম অনেকটা ওপরে। ঝুলতে ঝুলতে পৌঁছে গেলাম জলের ওপর, পায়ের তলায় কিছু নেই। একেবারে মহারাজ ত্রিশঙ্কুর দশা, স্বর্গ-মর্ত্য কোনটার সঙ্গেই সম্বন্ধ নেই।

কতক্ষণ কেটেছিল ত্রিশঙ্কু হয়ে বলতে পারব না। দম বন্ধ করে হাতের মুঠো দুটোয় মন প্রাণ সমর্পণ করে টিকে রইলাম। তার পর এক সময় টের পেলাম যে আস্তে আস্তে জলের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছি জল কোমর ছাড়াল, বুক ছাড়াল, গলা পর্যন্ত পৌঁছে পায়ের তলায় কি ঠেকল। তার পর দড়িটা একদম ঢিলে হয়ে গেল। দু পায়ের ওপর খাড়া হয়ে দম ফেললাম। দড়িটা কিন্তু কিছুতে ছাড়লাম না দড়িই তখন জীবন, জীবনটা দুই মুঠোর মধ্যে। মুঠো ফসকালেই সব ফরসা।

ফরসা হবার আগেই এক ফরমাশ শুনতে পেলাম। ঠিক ঘাড়ের কাছে কে বললে—রশি ধরে সাঁতার দাও। জলদি এগিয়ে চলো সামনের দিকে। ঐ দেখো নৌকা এসে পড়েছে। এখনই চাপা পড়বে।

দেখবার আর দরকার হল না। হাঁ করে কামড়ে ধরলাম দড়িটা দু হাত চালু হয়ে গেল। সাঁতরাতে গেলে দুখানা হাতই কাজে লাগাতে হয়।

সেই হাত দুখানা এখন পর্যন্ত অতি বিশ্বস্ত বন্ধু আমার। তাদের একখানার সাহায্যে এখন আমি সাঁতার কাটি। তবে সেই সমুদ্রের সঙ্গে এখনকার সমুদ্রটার কোথাও একটু মিল নেই। এখনকার সমুদ্র শুখনো টা টা করছে, এক ফোঁটা জল নেই। এই ভাবনার সমুদ্রের কূলকিনারা খুঁজে পাওয়া যায় না। মনের কথাটাকে মনের মত করে গুছিয়ে বলা কিছুতেই সম্ভব নয়। ভাবনার সমুদ্রে এই এক হাতের সাঁতার কোনও কালেই আমাকে কোনও কূলে ভেড়াতে পারবে না।

দু হাতে সাঁতার কেটে সেই রাতে পৌঁছেছিলাম যখন ওদের কাছে, তখনও মনের কথাটাকে মনের মত করে বোঝাতে পারে নি ওদের। কেন নৌকা ছেড়ে নেমে পড়লাম জলে, কেন অমন বদখত শখ চাপল আমার ঘাড়ে, কেন অমন বেহিসেবী সাহস দেখাতে গেলাম ইত্যাদি ইত্যাদি এক শ' রকমের কৈফিয়তের আঁচে সমুদ্রের মাঝখানে এক গলা জলে দাঁড়িয়েও দস্তুরমত তেতে উঠেছিলাম। তার পর নৌকার ওপর আবার যখন ফিরে এলাম, তখন এঁদের কাছেও কম নাকাল হলাম না। সকলেরই ঐ এক প্রশ্ন, খামকা অর্ধেক রাতে অজানা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলে কেন, তার সদুত্তর দাও।

সদুত্তরটি আজ পর্যন্ত কিছুতেই খুঁজে পেলাম না, ভাবনার সমুদ্রে এক হাতে সাঁতার কেটে কিছুতেই কোনও দিকে কূলকিনারা ছুঁতে পারলাম না। সুতরাং সন্তুষ্ট করব কাকে!

সত্যি কথাটা কিন্তু সকলের কাছেই সোজা ভাষায় বলবার চেষ্টা করেছি! বলেছি—জলে পড়বার এতটুকু শখ মনের কোণেও ছিল না আমার। জলে পড়তে হবে বুঝতে পারলে সেই গুণটাকে কিছুতেই ছুঁতাম না, দু হাতের মুঠোয় বাগিয়ে ধরা তো দূরের কথা। বাগিয়ে যেই ধরলাম, সঙ্গে সঙ্গে কার কারসাজিতে বলতে পারব না, দড়িতে টান পড়ল! ফলে বঁড়শিতে গেঁথা মাছের মত অবস্থা হল। তার পর তলা থেকে নৌকাখানা সরে গেল না আমার মুঠোয় ধরা দড়িটাই বেঁকে গেল তা ঠিক বলতে পারব না। হঠাৎ দেখি, পায়ের তলায় সেই রেড়ির তেলের সমুদ্র। তার পর দড়িতে ঢিল পড়ল, আমিও সমুদ্রে পড়লাম।

সোজা ব্যাপার, বুঝতে কারও এতটুকু কষ্ট হবার কথা নয়। কিন্তু এত সহজে কি কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারা যায়! বেশ, মেনে নেওয়া গেল ইচ্ছে করে জলে পড় নি তুমি, কিন্তু কেন ধরে মরতে গেলে দড়িটাকে? কি মতলবে অর্ধেক রাতে চুপিচুপি উঠে গিয়ে নৌকার গুণ ধরে দুলছিলে?

কটা কেনর জবাব যোগাব! অগত্যা মুখ বুজে ফেলেছিলাম। এখনও সেই মুখ বুজেই আছি। মুখ বুজে ভাবি, নৌকার ওপর পরমানন্দজীকে ভৈরবী যে কারণটি বাতলেছিলেন, সেইটেই বোধ হয় সত্যিকারের কারণ। সারা জীবনে আচম্বিতে আলটপকা যতগুলো কাণ্ড ঘটেছে তার পেছনে শক্ত শক্ত কারণ আছে সুনিশ্চিত। কার্যের আগে কারণ না থাকলে কার্যটার জাত মারা যায়। সুতরাং আমার প্রতিটি কর্মের জন্যে ভৈরবীর সেই তিনিই দায়ী। ভৈরবী অতি সংক্ষেপে জলে পড়বার হেতুটি বলে দিয়েছিলেন—ভূত আছে একটা

ওঁর কাঁধে। সেই ভূতটাই ওঁকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ভূতের চিত্তে কখন কি মতলবের উদয় হবে, তা কি কেউ বলতে পারে।

শুনে পরমানন্দজী পরম পরিতুষ্ট হয়েছিলেন কি না, তা বুঝতে পারি নি। আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত সবিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে আছি। অনেকটা নির্ঝঞ্ঝাটেও আছি বলা যায়। ভবিষ্যতের জন্যে কিছু মাত্র পরোয়া করি না, ভবিষ্যৎ যে ভূতের জিম্মায়! বর্তমানটুকু নিয়ে পরমানন্দে আছি। বর্তমান হল হাতের পাঁচ, বেইমানি করে না কখনও।

॥ সাত ॥

আবার করেও। চলতে চলতে হঠাৎ যদি পায়ের তলায় কিছু না থাকে, তা হলে সেটাকে বর্তমানের বেইমানি বলে মনকে প্রবোধ দিতে হয়। প্রবোধ দেবাব আগে খানিকটা নাকানি-চোবানি খাওয়া আর খানিকটা সাঁতরে পার হওয়া আছেই। তার পর আবার যখন কিছু ঠেকল পায়ের তলায় তখন হাঁফ ছাড়বার অবকাশ পেয়ে চুটিয়ে প্রবোধ দান কর মনকে। বুঝিয়ে বল যে ভাসাটা আর নাকানি-চোবানি খাওয়াটাই আসল ব্যাপার নয়, ওটা হল পায়ের ওপর ভর দিয়ে নিজেকে নিজে বয়ে বেড়ানোর হাত থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি লাভ। বোঝাতে বোঝাতে বর্তমানের বুকে পা ফেলে খানিক এগিয়েছ কি আবার ঝপাং, একদম অথৈ জল! প্রথমে তলিয়ে যাও তার পর ভেসে ওঠ, তার পর আবার খানিক সাঁতার দিয়ে এগিয়ে যাও। আচম্বিতে আবার পা দুখানা ঠেকবে কিছুর সঙ্গে। ব্যাস আবার এগিয়ে চল হাঁপাতে হাঁপাতে দড়ি

কাঁধে নিয়ে। সাবধান, খুব সাবধান, দড়িটি যেন হাত ফসকে না পালায়।

অতীত যে বাঁধা আছে দড়ির সঙ্গে। অতীতকে টেনে নিয়ে গিয়ে ভবিষ্যতের দরবারে হাজির করতে পারলেই বর্তমানটুকুকে বিচক্ষণতা সহ ব্যবহার করা হল। এরই নাম গুণ টানা, বর্তমান হল ঐ গুণ। ওটি যদি না ফসকায় মুঠো থেকে তা হলে অতি অবশ্যই অজানা ভবিষ্যতের গর্ভে হারিয়ে যাবে না।

হারিয়ে যাবার জো কোথায়! প্রতিটা দড়ির প্রান্ত দু ভাগে ভাগ করা, দুটি করে মানুষ প্রতিটা দড়ির প্রান্তে আটকে রয়েছে। একজন যদি হারায়, হারায় মানে তলিয়ে যায় বা হাঁপিয়ে পড়ে, অন্যজন তাকে সাহায্য করবে। এ ওকে ও একে সামলে নিয়ে চলবে। নৌকার মাস্তুলের ডগা থেকে যে ক'গাছা দড়ি নেমে এসেছে, তার প্রত্যেকটির মুখে দু-দুটি মানুষ আছে। এক দড়ির মানুষরা অপর দড়ির মানুষদের দেখতে পাচ্ছে না, দেখা সম্ভব নয়। মিসমিসে অন্ধকার, মসিবর্ণ বুক-সমান জলে নাক সমান উঁচু ঢেউ উঠছে, তার ভেতর কে কাকে দেখতে পাবে। কিন্তু চলেছি সবাই একমুখো, কি উপায়ে দিক ঠিক করে এগচ্ছি ভেবে পেলাম না। আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন তাঁর বেশ বয়েস হয়েছে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপারটা। টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে নৌকাখানাকে অন্য কোথাও পৌঁছে দোব না তো আমরা!

জবাব পেলাম—কাপ্তেন সাহেব হালে বসে আছে, নৌকার মুখ এক চুল এধার ওধার হবে না যতক্ষণ কাপ্তেন সাহেব জেগে থাকবে।

ব্যাপারটা মগজে সেঁধুল না। ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে যদি যাই আমরা

তা হলে কি হবে! আমাদের টানের চোটে নৌকা ডাইনে বাঁয়ে সরে আসবে না!

বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গীটি হেসে বললেন—তা কি হয় কখনও। নৌকার মুখ যে দিকে থাকবে সেদিকেই এগিয়ে যাবে। আমরাই ডাইনে বাঁয়ে গিয়ে পড়ব, আর ঐ দড়িগুলোতে আর টান থাকবে না। দড়িতে টান না ধরলেই বুঝতে হবে আমরা ডাইনে বাঁয়ে সরে গেছি। যতক্ষণ দড়ি টান টান হয়ে আছে, ততক্ষণ ঠিক পথে এগচ্ছি বুঝতে হবে। কাপ্তেন সাহেব তো আর ভুল করতে পারে না।

কচ্ছ উপসাগরের বুকে বুক সমান জলে দাঁড়িয়ে নৌকা-যাত্রার তৃতীয় রাত্রে একটা ভারী দামী কথা জেনে নিলাম। কথাটা হল, হাল যাঁর হাতে আছে, তাঁর কখনও ভুল হতে পারে না। আমাদের কাজ হল দড়িতে টান রাখা আর সেই টান টান দড়ি কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। কখনও সাঁতরে কখনও হেঁটে বিস্তর নাকানিচোপানি খেয়ে এগিয়ে যাওয়াটাই আমাদের কাজ।

দড়িটা টান রাখতে পারলেই হল, দড়িতে যদি টান থাকে তা হলে ঠিক সময় পার হওয়া যাবেই অন্ধকার। কারণ পেছনে যিনি হাল ধরে বসে আছেন তিনি কিছুতেই নৌকার মুখ এক চুল এধার ওধার হতে দেবেন না।

আস্তে আস্তে পার হতে লাগলাম অন্ধকার। আস্তে আস্তে আলোর মধ্যে এগিয়ে যেতে লাগলাম। মস্ত একটা ভুল ভেঙে গেল। উদয়-অস্ত দিয়ে গড়া দিন রাত, দিনের পরে রাত, রাতের পরে দিন দিয়ে শিকল গাঁথা জীবন, এই ধারণাটা হঠাৎ খসে গেল মনের গা থেকে।

ঠিক বুঝতে পারলাম, জীবন মানে কতকগুলো দিন আর কতকগুলো রাতের সমষ্টি নয়। জীবন হল গতি, অন্ধকার থেকে আলোয় আর আলো থেকে অন্ধকারে ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়ার নাম জীবন। খুব লম্বা একটা পথ, তার খানিকটা আঁধার আবার খানিকটা আলো। পথটা পার হতে হলে একবার আঁধারের মধ্যে ঢুকতে হবে আবার আলোর ভেতর দিয়ে যেতে হবে। দিন-রাত উদয়-অস্ত এ সমস্ত ভুল ধারণা, আসল ব্যাপার হচ্ছে যাওয়া আর যাওয়া। এগিয়ে যাওয়ার নাম হল জীবন এবং এগিয়ে যাওয়ার ওপর ছেদ পড়ার নাম হল মৃত্যু।

অবিচ্ছেদে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ খানিকটা উঠে পড়তে হল। জলের ভেতর সব জায়গা সমান নয়। কোথাও জল হাঁটু ছাড়িয়ে উঠছে না, কোথাও বা কোমর পর্যন্ত উঠেছে, কোথাও গলা তলিয়ে যেতে চায়। মাঝে মাঝে আবার সাঁতরাতে হচ্ছে। খানিকটা সাঁতার কেটে পার হয়ে উঠলাম এমন জায়গায় যেখানে জল কোমরের ওপর উঠল তখন দম নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকালাম। পেছনে অন্ধকার, অন্ধকারের মধ্যে বিটকেল কালো বিদকুটে একটা জানোয়ার উঁচু হয়ে ভেসে উঠেছে। ধীরে সুস্থে সেটা এগিয়ে আসছে আমাদের পানে, মানে আমাদের তাড়া করেছে! সর্বনাশ করেছে! আর এক মুহূর্ত দেরি করলাম না, হাঁপাতে হাঁপাতে দড়ি কাঁধে নিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

সেদিন সেই আলো-আঁধারির আলগোছ লগ্নে উদয় অস্ত জীবন মৃত্যুর আসল অর্থটা বড়ই ভয়ানক ভাবে বুকের মধ্যে ধরা পড়ে গেল। দিগন্ত-জোড়া মহাশূন্যতার মাঝখানে পড়ে পেছন ফিরে তাকালে অতি

পরিচিত অতি অন্তরঙ্গ একমাত্র আশ্রয় জীবন-তরণীখানিকে কেমন দেখাবে তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। জ্যান্ত বিভীষিকা, হিংস্র হাঙর, তাড়া করে ধরতে পারলে হাড় মাংস চিবিয়ে খাবে।

অনেক দিন আগে, জীবনের পোয়াখানেক পথও তখন পার হতে পারি নি, একজনের পাশে চুপটি করে বসেছিলাম তার বিদায় নেবার বিবর্ণ মুহূর্তটিতে। সন্ধ্যার পরেই বোঝা গিয়েছিল যে রাতটা আর পার করতে পারবে না সে, রাত থাকতে থাকতেই চুপি চুপি সরে পড়বে। ঘুম নয় ঠিক, কতকটা বেহুঁশ অবস্থায় পড়েছিল, জ্বালা যন্ত্রণা ব্যথা বেদনা কিছুই যেন ছিল না তার তখন, বরং বেশ শান্তিতেই ছিল বলা চলে। খুবই নিশ্চিন্ত হয়ে অপেক্ষা করছিল যেন নতুন একটা কিছু ঘটবার আশায়। তার পাশে তার বিছানার ওপর তার গা ঘেঁষে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলাম আমিও। চলে যখন যাবেই, কিছুতেই যখন রাখা যাবে না, তখন আর হাঁকুপাঁকু করে কি লাভ হবে!

রাতটা একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছিল। পা টিপে টিপে নিঃসাড়ে চলে যাচ্ছে রাতটা, আমি শুধু তাকিয়ে ছিলাম। স্তব্ধ হয়ে বসে রাতের পালিয়ে যাওয়া দেখছি বাধা দেবার শক্তি নেই, লাফ দিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে গলাটা টিপে ধরব রাতের, সে উপায় ছিল না। কেমন যেন একটা জবুথবু অবস্থা, টনটনে হুঁশ রয়েছে, কি হচ্ছে না হচ্ছে সব বুঝতে পারছি। কিন্তু নড়তে চড়তে পারছি না। চরম অসহায় অবস্থা যাকে বলে। সেই বিষম অবস্থায় পড়ে স্রেফ তাকিয়ে ছিলাম সেই রাতটার পানে। ভয়ানক নিঃশব্দে খুব আলগোছে পা ফেলে ফেলে ধীরে ধীরে রাতটা সরে পড়ছিল। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে-

ছিলাম আমি সেই পলায়মানা রাত্রির পানে, এতটুকু নড়া-চড়া করারও সামর্থ্য ছিল না।

হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগল স্তব্ধতার বুকে, দারুণ একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। নিদারুণ রকম চমকে উঠে তাড়াতাড়ি তাকে দু হাতে চেপে ধরলাম। মাথাটা বালিশের ওপর ঠেকে রয়েছে, ঘাড়টা উঁচু হয়ে উঠেছে, পিঠখানাও বিছানার সঙ্গে ঠেকে নেই। দু চোখ মেলে গেছে, ভয়ঙ্কর একটা বিভীষিকা দেখছে যেন চোখ মেলে। চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, কি বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম ঠিক বলতে পারব না। চেঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একটা কি দুটো হিক্কা তুলে স্থির হয়ে গেল সে। তার পর খুব আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ল। ঘাড় পিঠ আবার বিছানার ওপর ঠেকল। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম তার বুকের ভেতর আটকানো শ্বাসটুকু পড়বার আশায়। সেটা আর পড়ল না, বুকের ভেতরে আটকানো শ্বাসটা বুকের ভেতরেই রয়ে গেল।

আমার জীবনে সর্বপ্রথম সেই সত্যিকারের বিভীষিকা দেখা। তার চোখ দুটো দিয়ে জ্যান্ত বিভীষিকা দেখে ছিলাম আমি, যে বিভীষিকা দেখে সে দম ফেলতে পারল না, দমটাকে পর্যন্ত হজম করে নিথর হয়ে রইল। আমি দম ফেলতে পেরেছিলাম, তাই নিথর হয়ে যাই নি। আজ পর্যন্ত দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু বিভীষিকাটার অর্থ তখন ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি।

বহু দিন পরে ঘুরতে ঘুরতে করাচী থেকে কচ্ছে পৌঁছবার পথে হঠাৎ সেই বিভীষিকার অর্থটা মনের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম কি দেখে অমন ভয় পেয়েছিল আমার সেই একান্ত চেনা-জানা বন্ধুটি। আলোর মাঝে পৌঁছে পেছন ফিরে

তাকিয়েছিল। তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিল উলঙ্গ জীবনটাকে। অন্ধকারের ভেতর তাকিয়ে দেখেছিল, হ্যাংলা হিংস্র জীবনটা হাঁ করে তেড়ে যাচ্ছে তাকে ধরতে। দেখেই আঁতকে উঠে দিয়েছিল হাতের গুণটাকে ছেড়ে। ব্যাস, জীবন আর তাকে তাড়া করে ধরে ফেলতে পারে নি।

গুণটাকে আমরা কিছুতে ছেড়ে দিলাম না। তাই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তে হল। সামনে জলের ভেতর থেকে এক লাফে আকাশে উঠে গেল প্রকাণ্ড এক ডেলা টলটলে পারদ, পেছন থেকে বজ্রনির্ঘোষে কি কতকগুলো হুকুম শোনানো হল। আমরা থামলাম। পাশের সঙ্গীটি বললেন—নৌকা আর যাবে না, জল খুব কমে গেছে। আবার যখন জোয়ার লাগবে তখন এগনো যাবে।

অতএব তখন পিছোও, অথবা সেইখানে দাঁড়িয়ে দড়ি গুটোতে থাকো। নৌকাই ঐ কাছে এগিয়ে আসছে।

তাই করলাম, দাঁড়িয়েই রইলাম সেইখানে। এক পা এগতে পেছতে মন চাইল না। চাইবে কেন মন, মন তখন তাজ্জব বনে বসেছে। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে যতটুকু দেখা যাচ্ছে সেই কোমর সমান জলে দাঁড়িয়ে, তা দেখার জন্যে মন একেবারে প্রস্তুত ছিল না। কি কাণ্ড রে বাপু! জলের ভেতর থেকে একটু একটু করে এগুলো কি সব মাথা জাগাচ্ছে!

কিম্ভূতকিমাকার আকৃতি সব, কোনটা লম্বাটে, কোনটা উপুড় করা হাঁড়ির মত, কোনটা বা ঠিক কুমিরের ঠোঁট। একটা কুমির যেন আকাশের দিকে মুখ উঁচিয়ে স্থির হয়ে রয়েছে। একটু একটু করে জল কমতে লাগল, একটু একটু করে আত্মপ্রকাশ করলে তারা জলের

ভেতর থেকে। সবায়ের ওপর পুরু করে কাদার প্রলেপ পড়েছে। কার কি আসল পরিচয় বোঝার উপায় নেই।

পরিচয় গ্রহণ করার ফুরসতও আর মিলল না। এসে পড়ল নৌকা, এসে দাঁড়াল একেবারে বুক ঘেঁষে। হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার, নৌকা-শুদ্ধ মানুষ কোমর পর্যন্ত ঝুঁকিয়ে দেখছে। ঐ ঐ, ঐ ও রয়েছে, ঐ যে দেখা যাচ্ছে, উঃ কি ভীষণ লোক! যার যা খুশি বলে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে। একটি নতুন আবিষ্কার, যে লোকটা দিব্যি খাচ্ছিল ঘুমোচ্ছিল আর সেই হালের কাছে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হালে বসা লোকটার সঙ্গে গুজ গুজ ফুস ফুস করছিল, সে লোকটা যে কি সাংঘাতিক তা জানা হয়ে গেছে সকলের। নতুন ভাবে আবিষ্কার করা গেল লোকটা। ইস্ অমন একটা ভয়ঙ্কর জীব সঙ্গে চলেছে, এটা আগে বোঝা যায় নি তো!

গাঁট বাঁধা বাঁধা অনেকগুলো দড়ি ঝুলছিল নৌকার দু পাশ থেকে। সেই গাঁটে গাঁটে পা আটকে টপাটপ সবাই উঠে পড়লাম নৌকায়। লাঞ্ছনা গঞ্জনার আর বাকী রইল না কিছু। তৈরী হয়েই উঠেছিলাম, বোকা বোকা মুখ করে নিঃশব্দে সমস্ত সয়ে গেলাম। সইতেই হবে, ভালবাসা আত্মীয়তা আর হিতাকাঙ্ক্ষা এই তিনটি ব্যাপার যে সইতে পারে না, তার পক্ষে বনে বাস করাই শ্রেয়।

বনের জন্যে মন খারাপ করে বসে থাকার প্রয়োজন হল না। দেখতে দেখতে চতুর্দিকে বন গজিয়ে উঠতে লাগল। উদ্ভট উৎকট চেহারার যে সমস্ত জন্তু জানোয়ার আত্মপ্রকাশ করল জলের ভেতর থেকে, তাদের গা থেকে শুখিয়ে ঝরে গেল কাদা মাটি, হাওয়ার সঙ্গে

মাথা দোলাতে লাগল সবাই। আসল পরিচয় পাওয়া গেল সকলের। প্রকাণ্ড এক জঙ্গল, সবই প্রায় বাবলা আর ঘোড়ানিম, তার সঙ্গে নানা জাতের সিজ। তুনিয়ায় যত জাতের সিজ গাছ আছে, সমস্ত সেই বাবলা আর ঘোড়ানিমের জঙ্গলে অধিষ্ঠান করছে।

কোথাও একটু ছায়া নেই, নৌকার তলা ঠেকে গেছে কাদায়। তুপুরের আগেই জল কাদা টগবগিয়ে ফোটার উপক্রম হল। বিতিকিচ্ছি গন্ধে প্রাণ যায় আর কি! যুগযুগান্ত ধরে শামুক গুগলি কাঁকড়া পচছে। জোয়ার ভাঁটার টানে রাশি রাশি এসে পড়ে সমুদ্র থেকে, গাছপালার ভেতরে আটকে যায়। জল নেমে গেলে ওরাও নামবার ব্যবস্থা করে। ওদের যেমন চলন, বিশুদ্ধ গদাইলস্করি চালে চলতে থাকে। চলা শুরু হবার পরে আবার আসে জোয়ার, তার সঙ্গে আসে আরও স্বজাতিরা। এসে তারা ঘাড়ের ওপর চেপে বসে। জোয়ারের পর ভাঁটা এবং ভাঁটার পরে জোয়ার এই টানা-পড়েনের ফাঁকে কোথাও কোনও দিকে পালানটা ওদের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না। অবিশ্রান্ত স্বজাতির আগমনে স্বজাতির চাপে স্বজাতি ধ্বংস হয়। কি করবে, তা বলে নিজস্ব ধাঁচের চলনটা তো আর বদলাতে পারে না।

পরমানন্দজী বললেন—এই ভাবেই ধরিত্রীটা তৈরা হয়েছে। জলচর জীব-জন্তুর দেহ জমতে জমতে গড়ে উঠেছে এত বড় ধরিত্রীখানা। প্রবালদ্বাপ কথাটা শুনেছেন তো। প্রবালদ্বীপ কি করে তৈরী হয়, আন্দাজ করে নিন।

বললাম—তৈরী হতে একটি পয়সা খরচ হয় না, তা বেশ বুঝতে পারছি। সুতরাং আমাদের ধরিত্রীখানার যে কানাকড়ি মূল্য নেই,

এটাও প্রমাণ হচ্ছে। কিন্তু এই দুর্গন্ধটা! অতবড় ধরিত্রীখানা তৈরী হতে কি ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ ছুটেছিল, সেটা আন্দাজ করতে গিয়েই যে প্রাণ খাঁচাছাড়া হতে চাচ্ছে।

পরমানন্দজীর চোখ দুটি ছোট হতে হতে প্রায় বুজে এল, দু-চোখের মাঝখানে সাদা সাদা দুটি রেখা মাত্র দেখা যাচ্ছে। সেই রেখা দুটি থেকে এমন অদ্ভুত জাতের আলো ঠিকরে বেরচ্ছে যে সে দিকে তাকিয়ে থাকা দায়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই অবস্থায় স্থির হয়ে বসে রইলেন তিনি, অনেক কিছু যেন ভাল করে দেখে বুঝে মিলিয়ে নিলেন নিজের ভেতরে। তার পর আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন—ঠিক বলেছেন, সর্বাগ্রে গন্ধ উৎপন্ন হয়েছিল। পৃথ্বীতত্ত্ব হল গন্ধ, এই জন্যে মানস পূজার সময় আমরা মনে মনে ভাবি যে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্বের প্রথম তত্ত্ব যে ক্ষিতি সেই ক্ষিতির গুণ হল গন্ধ। আমার দেহের ঐ ক্ষিতিতত্ত্ব বা গন্ধ ঐটি মানস পূজার প্রথম উৎসর্গ করতে হয় চন্দন হিসেবে। তার পর আমার দেহের আকাশ-তত্ত্বটি হয় পুষ্প, বায়ু তত্ত্বটি হয় ধূপ, তেজতত্ত্বটি হয় দীপ। তারপর যা পড়ে থাকে, অপ বা জল সেই জলত্বকে অমৃত স্বরূপ কল্পনা করে নৈবেদ্য নিবেদন করি। ঠিকই বলেছেন, এই ধরিত্রী সৃষ্টির মূল কথা হল গন্ধসৃষ্টি। গন্ধতত্ত্ব হল পৃথ্বীতত্ত্ব, চমৎকার মিলে যাচ্ছে! আপনার কথাটা খুব ভাল ভাবে মিলে গেল।

মিলে যে গেল তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি তখন। কিন্তু শুধু মিললেই তো হল না, সেটা আবার সহ্য হওয়াও চাই। বললাম—কিন্তু আর যে সহ্য হচ্ছে না পরমানন্দজী, এখন এই মিলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বাতলান। যখন জোয়ার আসবে তখন নৌকা ছাড়বে,

আর ততক্ষণ আমাদের যদি এই সৃষ্টিতত্ত্ব সহ্য করতে হয়, তা হলে পাগল হয়ে যাব। বাপস্, এই দুর্গন্ধে মানুষ টিকতে পারে!

পরমানন্দজীর উৎসাহ চরমে গিয়ে পেঁৗছল, চাঙ্গা হয়ে উঠে তিনি তখন গন্ধতত্ত্ব বোঝাতে শুরু করলেন। বললেন—খুব সোজা, গন্ধটা সইতে পারছেন না, আপনার দেহের মধ্যে গন্ধ বোধ করার যে শক্তি সেটিকে অকেজো করে ফেলুন। তখন ঐ গন্ধ আপনার কিছুই করতে পারবে না।

কি সর্বনাশ! চক্ষু কপালে তুলে বললাম—তার মানে দম বন্ধ করে থাকতে বলেছেন! মারা পড়বে যে।

দম বন্ধ করে থাকবেন কেন, শ্বাসপ্রশ্বাস যেমন চলছে তেমনি চলবে অথচ গন্ধ বোধ আর থাকবে না, এইটে করলেই হল। নেহাত ভালমানুষের মত উপদেশটি প্রদান করে সেই নিজস্ব ঢঙের চাউনিব হাসিটি হাসতে লাগলেন পরমানন্দজী। দেখে সর্ব শরীর জ্বলে ওঠার দাখিল হল। হলে হবে কি, হেসে না ফেলে থাকতে পারলাম না। পরমানন্দজী যখন ওঁর চাউনি দিয়ে হাসতে থাকেন, তখন কার সাধ্য সেই আলোর হাসিকে পরোয়া না করে চটাচটি করবে। তবুও যতদূর সম্ভব চক্ষু গরম করে বললাম—ঠাট্টা করবার সময় পেলেন না আর। ঐ যে একটা কথা আছে না, আমি মরছি দেনার জ্বালায় হুকুম হল জোলাপ খেতে, তেমনি দাঁড়াচ্ছে। উঃ, এই দুর্গন্ধ সয়ে মানুষ বাঁচতে পারে!

টপ করে লুফে নিলেন যেন আমার কথাটা পরমানন্দজী। বলে উঠলেন—কি! কি! কি যেন বেশ বললেন। টাকা চাইতে গিয়ে জোলাপ খাওয়ার পরামর্শ পেল। বাঃ বাঃ তোফা—ঠিক ঐ কথাটাই

তো বলতে চাচ্ছি। দেনার জ্বালায় যে মরছে তাকে খাইয়ে দাও কড়া জোলাপ। দেনার জ্বালাটা আর থাকবে না, জোলাপের ক্রিয়া শুরু হলে টাকা-কড়ির চিন্তা দেশ ছেড়ে পালাবে। ঠিক সেই ব্যাপারই করতে হবে। মনে করুন, আপনার ঐ শরীরটা একটা অদ্ভুত জাতের বেতারযন্ত্র, ওটা দিয়ে আপনি ইচ্ছে মত যে কোনও স্টেশন ধরে গান শুনতে পারেন, বক্তৃতা শুনতে পারেন, কোথাও কোনও ভাল খেলা হচ্ছে সেটা শুনতে পারেন। দরকার হল, চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যে স্টেশন ধরতে চান সেই স্টেশনের সঙ্গে আপনার যন্ত্রটাকে মিলিয়ে নেওয়া। এখন আপনার ঐ বেতারযন্ত্র গন্ধ শুঁকছে। চাবি ঘোরাতে থাকুন, যতক্ষণ না গান শোনা শুরু হয় ঘুরিয়ে যান চাবি, ঠিক জায়গায় কাঁটাটা সরে গেলেই গান শুনতে পাবেন, গন্ধ শোঁকা বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার ভেতরের পৃথ্বীতত্ত্ব এখন খুব জেগে উঠেছে, আকাশতত্ত্বটিকে জাগানো বা বায়ুতত্ত্বটিকে বা তেজতত্ত্বটিকে। যেটিকে যখন জাগাবেন, সেটি তখন কাজ করবে। এর মধ্যে আর শক্ত ব্যাপার কোথায় !

কোথাও নেই, সমস্তটাই তুলতুলে নরম কাণ্ডকারখানা। পরমানন্দজীর গলার আওয়াজ, ওর খুব আলতো ভাবে উচ্চারণের ঢঙ্, ওঁর আধা-ঘুমন্ত হাস্য-সঙ্কুল চাউনি এই তিনটি অতি ভয়ংকর অস্ত্রের সামনে বসে বিশ্বের বিলকুল সমস্যাকে সত্যনারায়ণের সিন্নির তুল্য মনে হয়। স্রেফ মুখে ঢাল আর গেল, কোথাও আটকায় না। আটকালও না, চুপ করে বসে গিলতে লাগলাম। পরমানন্দজী সিন্নি ঢালতে লাগলেন—ঐ গন্ধ, ঐ উৎকট গন্ধ খুব সূক্ষ্ম অবস্থায় আপনার ভেতর রয়েছে। বাইরের গন্ধটা আপনার ভেতরের সেই সূক্ষ্ম গন্ধটাকে ভয়ানক রকম জাগিয়ে দিয়েছে। খুব ভাল সুর বাইরে কোথাও হল, সেটা গিয়ে

আঘাত হানল আপনার ভেতরের সূক্ষ্ম সুরটিকে যেটা ঘুমিয়ে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল আপনার ভেতরের সুর আপনি বাইরের গান শুনে মোহিত হয়ে গেলেন। বিশ্বসংসারে যেখানে যত প্রকারের গান গন্ধ আছে তা অতি সূক্ষ্ম ভাবে ঘুমিয়ে আছে আপনার মধ্যে বাইরের সঙ্গে ভেতরেরটার সংস্রব ঘটলেই শুরু হয় অনুভূতি। কেমন! বুঝছেন এখন কিছু কিছু?

আমার একটা হাঁটু চেপে ধরলেন পরমানন্দজী। আমার চোখের ওপর ওঁর চোখ দুটির সম্পূর্ণ দৃষ্টি ফেলে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—বুঝছেন এখন?

ভ্যাবাচাখা খেয়ে গেলাম, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—কি?

ঐ শক্তিটা—পরমানন্দজার গলার স্বর আরও কমে গেল। প্রায় ফিসফিসিয়ে বলতে লাগলেন—আরও একটু তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন না একবার, আপনার ঐ রেডিও সেটটার গোড়ার কথাটা একটু ভাবুন না। রেডিওতে ইলেকৃট্রিক থাকা চাই। ব্যাটারী থেকেই হোক বা বাড়ির ইলেক্ট্রিক থেকে হোক মোটের ওপর ইলেকৃট্রিক থাকা চাই-ই-চাই। নয়তো ঢুঁ ঢুঁ, গান গল্প সুখ দুঃখ সব একেবারে বন্ধ। কেমন কি না?

বোকার মত ঘাড় নাড়লাম—তা তো বটেই।

সেই ইলেকট্রিকটা কোথায় আছে আপনার ভেতরে? উত্তর পাবার আশায় চোখ কুঁচকে অপেক্ষা করতে লাগলেন পরমানন্দজী।

উত্তর আর দিতে হল না। আর একটু ঝুয়ে আরও একটু গলা খাটো করে বলতে লাগলেন—ঐটিই হল গোড়ার কথা, একদম গোড়ার কথা। শুধু গান গন্ধ নয় আরও গোড়ার কথা। ঐ কাম, ঐটি যে

কোন্ জাতের শক্তি, ঐটির উৎপত্তি কোথায়, তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন। ঐটি যদি এখনই উহ্য হয়ে যায় সংসার থেকে তা হলে সংসারটা টিকবে কদিন একবার ভাবুন। ভাবুন—

ভাবনার আর অবকাশ মিলল না। ঘেমে নেয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে ভৈরবী এসে উপস্থিত হলেন। সংবাদ—কলসী কলসী তুধ এসে গেছে নৌকার ধারে। তুধ একেবারে জলের মত সস্তা। এক কলসী চার আনা। সঙ্গে চিনি মিছরি সুগন্ধি চাল, অতএব পায়েস খাওয়ার এত বড় সুযোগটা ফসকে যেতে দেওয়া কি উচিত হবে।

তুধ। শামুক গুগলি কাঁকড়ায় তুধও দেয় নাকি!

নির্বিকার পরমানন্দজী তখন বোঝাচ্ছেন ভৈরবীকে, ও তুধ একদম ঠেঁটে টেকানো যাবে না এমন বদবূ। ওয়াক্ থু, উটের তুধ কি মানুষে খেতে পারে!

চিমটি কাটার সুযোগ পেলে চিমটি না কেটে থাকা যায় না, এটা যে কোন তত্ত্বটির ক্রিয়া কে জানে। তৎক্ষণাৎ ঐ চিমটি কাটার তত্ত্বটি সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল। বললাম—বদবূ! রামশ্চন্দ্রঃ, বদবূ আবার কি! পায়েস মুখে দেবার সময় রেডিওর চাবিটা ঘোরাতে ঘোরাতে একেবারে এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে, যেখানে গোলাগুলি চলেছে, খুন-খারাপি হচ্ছে, চারিদিকে আগুন লেগে গেছে। ব্যাস, নিশ্চিন্তে পায়েস গেলা যাবে, আর খুনোখুন দেখা যাবে, বদবূ টদবূ কিছু মালুম হবে না।

পরমানন্দজী অতি অমায়িক চালে জানতে চাইলেন—এতক্ষণ যে গল্প করলাম আমরা, কই, বদবূ তো তেমন পেলাম না! আপনিই তো বলছিলেন, সারা দিন এখানে নৌকা বাঁধা থাকলে তুর্গন্ধে প্রাণ বেরিয়ে যাবে, সে তুর্গন্ধটা গেল কোথায়!

কোথায় আবার যাবে। দুর্গন্ধটা তৎক্ষণাৎ সহস্র গুণ সজীব হয়ে উঠে সজোরে ধাক্কা মারল। তাড়াতাড়ি নাকে মুখে চাদর চেপে ধরলাম। নাক মুখ ঢাকতেই হল, পরমানন্দজীর চোখের পানে তাকানো সম্ভব নয়। ওঁর চোখ দুটি বড্ড বেশী হাসছে। হাসবেই, নিদারুণ ঠকে গেছি যে আমি। ওঁর সব তত্ত্ব কথা শোনার তালে পড়ে গিয়ে সত্যিই এতক্ষণ গন্ধটাকে ভুলে গিয়েছিলাম। অর্থাৎ আমার শরীর-রূপ রেডিও যন্ত্রে গন্ধ নেবার চাবিটা ঘুরে গিয়েছিল। কি ফ্যাসাদ দেখ!

## ॥ আট ॥

ফ্যাসাদ বলে ফ্যাসাদ, জোড়া জোড়া চোখ নিয়ে জলজ্যান্ত ফ্যাসাদরা সশরীরে আবির্ভূত হল হাঁটু সমান ভটভটে পচা পাঁকের ভেতর। নৌকাখানাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শুধু তারা। কিছু চাইলও না, নিলও না, চাওয়া-পাওয়ার হিসেব তারা ভুলে মেরে দিয়েছে! তাদের চাউনিতে কামনা নেই, লোভ তাদের ত্রিসীমানায় পৌঁছতে পারে না। তাদের চাউনি বলতে চাচ্ছে শুধু যে তারা আর পারছে না। বেঁচে থাকতে থাকতে তারা হয়রান হয়ে পড়েছে। শুধু শুধু বেঁচে থাকাটা যে কি ভয়ঙ্কর ফ্যাসাদে পড়ে যাওয়া, তা যদি জানতে চাও তা হলে চলে যাও সেই আধা-ডুবন্ত আধ-ভাসন্ত চড়াগুলোয়। করাচী থেকে কচ্ছে আসার জলপথে পড়বে সেই দ্বীপগুলো। সেখানেও কিছু মানুষ বাস করে, মানুষদের সঙ্গে কিছু মেয়েমানুষও আছে সেখানে। মানুষ মেয়েমানুষ আছে বলে তাদের কাচ্চা-বাচ্চাও হয়।

সবাই তারা বেঁচে আছে। দেদার ধান জন্মায়, দাঁত্নড়ে মাছ ধরে। পেট ভরে খেতে খেতে আর বেঁচে থাকতে থাকতে তারা বড় ফ্যাসাদে পড়ে গেছে। নিরেট নিশ্ছিদ্র জগদ্দল পাথরের মত আস্ত আস্ত জীবন বুকে চেপে বসে আছে তাদের। সেই ভীষণ বোঝাটা সম্বল করে তারা আর বেঁচে থাকতে পারছে না।

তারা কেউ অসভ্য নয়। কোল ভিল সাঁওতালদের মত সাজ-পোশাকের পরোয়া করে না তারা, এ ধারণা করলে মস্ত ভুল করা হবে। দস্তুরমত পাজামা পাঞ্জাবি পরে আছে সবাই, মেয়েরা পরেছে বেশী রকম রঙচঙে চুড়িদার পিরান। মেয়ে পুরুষ প্রত্যেকে মাথায় জড়িয়েছে নানা রঙের রুমাল। উদ্ভট দর্শন পাথরের মালা ঝুলিয়েছে সবাই গলায়, প্রত্যেকের আঙ্গুলে পাথর বসানো আংটি। তাও কি এক-আধটা, দু হাতের দশটা আঙ্গুলে কম-সে-কম পনের-বিশটা তো হবেই। সব আংটি পেতলের বা চাঁদির তৈরী, সমস্ত আংটিতে লাল সবুজ হলদে কালো নানা জাতের পাথর বসানো। মেয়েদের নাকে কানে পাথর বসানো গয়না, গয়নার ভারে নাক কান ছিঁড়ে পড়তে চায়। কাচ্চা-বাচ্চাদের গলাতেও গোছা গোছা চাঁদির হার, কাচ্চা-বাচ্চারাও উলঙ্গ নয়। সব সুদ্ধু মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, তারা কেউ হাড়হাবাতে উনপাঁজুরে হতচ্ছাড়া হতচ্ছাড়ী নয়। তবু যেন তাদের কিচ্ছু নেই, তারা যেন সর্বস্বান্ত হয়ে বেঁচে রয়েছে। জীবনধারণ করতে গেলে খেতে পরতে হয় এবং খেতে পরতে পেলেই বেঁচে থাকা যায়। খেয়ে পরে বেঁচে থাকাটা যে কি নিষ্ঠুর ভাবে বেঁচে থাকা, তা যেন উলঙ্গ হয়ে ফুটে আছে তাদের চোখগুলোতে। উলঙ্গ সমুদ্রের চাউনির সঙ্গে তাদের চাউনি সম্পূর্ণ মিলে যায়।

ওরা সবাই সওদা নিতে এল। বস্তা বস্তা চাল ঝুড়ি ঝুড়ি খেজুর আর শুঁটকী মাছের গাঁট তুলে দিয়ে গেল নৌকায়, নিয়ে গেল তার বদলে কয়েক গাঁট জামা পাজামা, নুনের বস্তা কয়েকটা আর কয়েক টিন কেরোসিন। একটা কাঠের বাক্স বোঝাই শৌখিন জিনিস-পত্র একদম বিনা পয়সায় সওগাত দিলেন আমাদের কাপ্তেন সাহেব। ওটা নাকি দিতেই হয়। না দিলে দোস্তি থাকে না। আংটি পাথরের মালা, নাক কানের গয়না আর আয়না চিরুনি, এগুলো কে কিনতে যায়। না পেলে কিন্তু নৌকার ওপর উঠে আসতে পারে সবাই। এসে নিজেরা নৌকা হাতড়ে যা খুশি নিয়ে যেতে পারে।

সহজে তো আর কোনও নৌকা ওদের ওখানে ভেড়ে না। জোয়ারের জল নেমে না গেলে আমরাই কি আসতাম, সিধে ওদের দ্বীপটা পেরিয়ে ওধারের দরিয়ায় পৌঁছে এতক্ষণে পাল তুলে দিয়ে উধাও হয়ে যেতাম।

দিনের পর দিন ওরা তাই দেখে। নৌকা আসে, নৌকা চলে যায়, ওরা সবাই ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ পেট ফোলা পালের দিকে তাকিয়ে থাকে আর মনে মনে হাত কামড়ায়। মানুষ ওরা দেখতে পায় না, মানুষের পানে তাই ওরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। অপর্যাপ্ত ধান সুদ্ধ বেঁচে থাকতে থাকতে বেঁচে থাকা কাজটার ওপরেই ওদের বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। সেই বিতৃষ্ণায় ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে ওদের চোখের চাউনি। ঘোলা চোখে কোনও রঙের ছোপ পড়ে না।

যেমন সমুদ্রের ঘোলা জলে আকাশের রঙ ধরা পড়ে না। ঘোলাটে সমুদ্রের বুকে দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছে নৌকা, চড়া পার

হয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি। কখন বাড়ল জল কখন নৌকা ছাড়ল, কিছুই টের পাই নি। নৌকার খোলের মধ্যে বালির গাদায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙতে ওপরে উঠে গিয়ে দেখলাম, সব কখানা পাল বুক চিতিয়ে পেট ফুলিয়ে দিগন্ত পানে তাকিয়ে রয়েছে। সব কজন মানুষ নৌকার পাড়ের ওপর দড়ি-দড়া হাতে নিয়ে স্থির হয়ে বসে আছে। নৌকাখানা যেন আসমান দিয়ে উড়ে চলেছে, ঘোলাটে জল নৌকার তলায় ঠেকছে কি ঠেকছে না।

তাড়াতাড়ি চারিদিকে নজর ফেলে দেখলাম। না, তারা নেই, কাদা মাখা গাছপালা ঝোপ-জঙ্গল সুদ্ধ তাদের সেই ডাঙ্গাটুকু একদম লোপাট। শুধু জল, কাদা গোলা জলের ওপর পালে পাল জরদ্গব ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে হাই তুলছে। কেউ একটু নড়ে চড়ে না, ঐ হাই তোলার দরুন মাঝে মাঝে যা একটু ফুলে ফেঁপে ওঠে।

নৌকার কিনারায় বুক পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়ে চুপচাপ চেয়ে রইলাম। ফেলে যাদের এলাম, তাদের চোখগুলো খুবই স্পষ্ট ভাবে দেখতে লাগলাম জলের মধ্যে। দেখতে দেখতে খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। তাদের চিনি না, তাদের জানি না, তাদের ভাষা পর্যন্ত বুঝতে পারি নি। তবু তাদের জন্যে বুকের ভেতরে কোথায় যেন একটা ফোড়া আউরে উঠল। আচম্বিতে একটা আজগুবী খেয়াল উদয় হল মগজের মধ্যে। কেমন হয়! ওদের সঙ্গে সেই নাম-না-জানা দ্বীপে আমৃত্যু দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করলে কেমন নিরঙ্কুশ নিশ্চিন্ত হয়ে জীবন কাটানো যায়! ছুটি মিলে যায় একেবারে, লম্বা চওড়া ধরণীখানার বুকে ছুটোছুটি করে মরার হাত থেকে, জন্মের শোধ নিস্তার পাওয়া যায়।

ওরাও কি এখনও তাকিয়ে আছে দূর দিগন্ত পানে! আমাদের

মাস্তুলের ডগায় ডগডগে লাল ছোট্ট পতাকাখানি এখনও হয়তো দেখতে পাচ্ছে তারা! তারা হয়তো আশা করছে, কোনও একটা অঘটন কাণ্ড ঘটে যাবার দরুন আমরা হয়তো নৌকার মুখ ঘুরিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হব ওদের কাছে। তার পর বেশ কিছু দিন ওদের সঙ্গে থাকতে হবে আমাদের। ওদের মনের জ্বালা জুড়বে। মানুষ হয়ে মানুষকে যে ভাবে আমরা হেনস্তা করে ফেলে এলাম, তার উপযুক্ত ফল ওরা সুদে-আসলে উসুল দিয়ে দেবে। আদর আপ্যায়ন অনাবিল আত্মীয়তা দিয়ে এমন ভাবে জুড়িয়ে দেবে আমাদের মন যে আবার যখন নৌকা ভাসাবার সময় হবে তখন আমরা কেঁদে কূল পাব না। বুকের মধ্যে প্রত্যেকটি তন্ত্রী বিচ্ছেদব্যথায় গুমরে গুমরে উঠবে।

তাই নাকি হয়েছে।

সন্ধ্যার পরে বৃদ্ধ পার্শী দম্পতিটির সামনে বসে এক আজব কাহিনী শুনলাম। তাঁর নামটি ঠিক মনে করে উঠতে পারছি না। বেশ লম্বা নাম, [illegible] ছন্দ মিল সুর আছে তাঁর নামে। কি যেন আদমজী পদম ভাই ইত্যাদি গোছের ব্যাপার। অতবড় নামটাকে আমরা সংক্ষিপ্ত করে আদমজী বা আদম সাহেবে দাঁড় করিয়ে ফেললাম। নৌকার ওপর তিন তিনটে রাত কাটবার পরে চতুর্থ রাতের শুরুতে তাঁদের সঙ্গে সবায়ের আলাপ পবিচয় হল। সবাই ঠাওরে বসেছিলাম, ওঁরা হলেন ওমরাহ-গন্ধী ওঁচা। নৌকা সুদ্দ মানুষের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রেখে নিজেদের আভিজাত্য বাঁচিয়ে যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছবেন। হঠাৎ কি থেকে কি দাঁড়িয়ে গেল, বলতে পারব না। দেখা গেল, মহিলাটি ভৈরবীর কম্বলের কিনারায় বসে গালে হাত দিয়ে তুলকালাম হিন্দী বাত হজম করার চেষ্টা করছেন। বিষম রকম উত্তেজিত হয়ে দু হাত আর মুখ মাথা নেড়ে

ভৈরবী তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন দক্ষযজ্ঞ ব্যাপারটা। মানে দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শোনার দরুনই দেহত্যাগ করেছিলেন কিনা সতী, সুতরাং দেহত্যাগটা না বোঝাতে পারলে কি করে তিনি বোঝান যে সতীর দেহ, কেন খণ্ড খণ্ড হয়েছিল। এবং খণ্ড খণ্ড যতক্ষণ না হচ্ছে সতীর দেহ ততক্ষণ হিংলাজ তীর্থটির উৎপত্তি আসে কেমন করে। সেই দক্ষযজ্ঞের মীমাংসা করার দরুন পরমানন্দজীকে গিয়ে যোগদান করতে হল। ভৈরবীর হিন্দী বাতকে ঢেলে সেজে তিনি পার্শী মহিলাটিকে বোঝাতে লাগলেন। কৈকেয়ীনন্দন মিশ্র মহারাজ আবার দুর্দান্ত রকমের মা-কালী ভক্ত। বহুত বকরা তিনি চড়িয়েছেন কলকাত্তাওয়ালী কালীর কাছে। দখ্‌স্‌ মহারাজ আর দুগ্‌গা মাঈ যে বাপ বেটী, এও তাঁর অজ্ঞাত নয়। সুতরাং তিনিও আসন নিলেন সেখানে। দেখতে দেখতে দস্তুরমত একটি সভা জমে উঠল। আদমজী পদমভাইও সেখানে না গিয়ে পারলেন না। তার পর আমার খোঁজ পড়ল। মিশিরজী মহারাজ স্বয়ং এসে নৌকার ধার থেকে টেনে নিয়ে গেলেন আমায়। খপ করে এক-খানা হাত ধরে সত্যিই হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন। মানে—আদমজীর নাকি ভয় হয়ে গিয়েছিল। সভাস্থ হয়ে সেই দক্ষযজ্ঞের মাঝখানেই তিনি শঙ্কাটা প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। লোকটা আস্ত আহম্মক তো। নৌকার ধারে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আবার কি খেয়াল গজিয়ে উঠবে মগজে কে বলতে পারে। হয়তো পড়বে আবার লাফিয়ে দরিয়ায়। দরকার কি ওর ওখানে একলাটি দাঁড়িয়ে থাকার! ধরে নিয়ে এসো, সবাই আমরা এখানে বসে গল্প-সল্প করছি, ও কেন একলাটি আলাদা হয়ে থাকবে।

সুতরাং আমাকেও দক্ষযজ্ঞে যোগদান করতে হল।

দক্ষযজ্ঞটা কিন্তু বেশীক্ষণ চলল না। যজ্ঞ কর্মটি হল অগ্নি উপাসকদের ধর্ম, ভারতবর্ষে অগ্নি উপাসক ছিলেন পার্শীরা, পার্শীরাই আসল আর্য। পারস্য থেকে সেই আদিম কালে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন। অগ্নির উপাসনা থেকেই সনাতন হিন্দু ধর্মের সৃষ্টি। অর্থাৎ হিন্দু ধর্মটা আসলে পার্শীদের জরথুস্ত্র প্রবর্তিত ধর্ম ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক সব আসল কথা উঠে পড়ল। পরমানন্দজীর তত্ত্বকথা শুনতে গিয়েই মাথার ঘিলু গলে জল হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল, এবার তার সঙ্গে সংযুক্ত হল পরম বিজ্ঞ আদমজী পদমজীর ঐষ্টিক ইতিহাস। ইতিহাসের পূর্বতন পঁয়ষট্টি পুরুষও যাঁদের নাগাল পায় নি, তাঁরা কবে কি মতলবে পারস্য দেশ থেকে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তা শুনে হতভম্ব হয়ে পড়লাম। আগুন জ্বালাবার কায়দাটুকু রপ্ত করতে পারার দরুন এমনই কেউকেটা ঠাওরেছিলেন নিজেদের যে সেই পারস্য থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছিলেন ভারতে। মতলব! মতলব অতি সোজা, আগুন জ্বালিয়ে আমাদের ভড়কে দেবেন।

আজ আমরা ঐ কর্মটি একটি মাত্র কাঠির সাহায্যে সম্পন্ন করতে পারি। এবং পঞ্চাশ ষাটটা কাঠি সুদ্ধ একটি দেশলায়ের মূল্য মাত্র এক আনা।

শুনে আসল আর্যদের ওপর অনুকম্পা হল একটু। ফস্ করে একটা কথা জিজ্ঞেস করে বসলাম।

আচ্ছা আদমজী, ঐ যে যাদের ইরানী বলি আমরা, তারা তো ইরান দেশের মানুষ। মানে, তারাও পার্শী। তারাও কি অগ্নি-উপাসক নাকি। কলকাতা বোম্বাই দিল্লী, ভারতবর্ষের সর্বত্র ঐ ইরানীদের দেখা

যায়। মেয়ে পুরুষ কাচ্চা বাচ্চা ঘর সংসার ঘাড়ে করে জীবন ভোর ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঠে ঘাটে কাপড় কম্বলের তাঁবু বানিয়ে খাসা খাচ্ছে-দাচ্ছে, আমোদ-আহ্লাদ করছে। খাজনা দিতে হয় না, চাষ আবাদ করতে হয় না, একদম যাকে বলে নির্ঝঞ্ঝাট যাযাবরের দল। ওরাও কি আমাদের আসল পূর্বপুরুষের জাত। জরথুস্ত্র কে ছিলেন, কেমন ধর্ম প্রচার করেছিলেন, জানি না। কিন্তু ওদের দেখলে তো ধারণা হয় যে ওরা কাঠকুটো কুড়িয়ে এনে ইঁট পাথর জমা করে তার মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে ভাত রুটি বানানো ছাড়া অন্য কোনও জাতের অগ্নি উপাসনার ধার ধারে না।

আদমজী গম্ভীর ভাবে কয়েকবার মাথা দুলিয়ে বললেন—হাঁ, ওরাই আসল আর্য। আসল পার্শী হল ওরাই। জরথুস্ত্র নামটাও হয়তো শোনে নি ওরা, কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের মূল অনুশাসনটি আজও মেনে চলছে। ঘর বেঁধে এক জায়গায় থেকো না, এক জায়গায় ঘর বেঁধে থাকলেই একটু ভুল ধারণায় মজে যাবে। ভাবতে শুরু করবে, এই জমি আমার। জমি কিন্তু কারও নয়, কয়েকটা দিনের জন্যে এই পৃথিবীতে এসে পৃথিবীর এক টুকরো মাটিকে নিজের বলে মনে করাটা পাপ। মহাপাপ—

পরমানন্দজী তাঁর মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে তেড়ে বলে উঠলেন—আপনাদের জরথুস্ত্র কেন, আমাদের গীতাতেও বলা হয়েছে—অনিকেত। অনিকেত মানে নিকেতন যার নেই, অর্থাৎ নিয়ত বাস-শূন্য অর্থাৎ—

হাঁ, আপনাদের গীতাতেও তা বলেছে। আদমজী আবার মাথা নাড়া শুরু করলেন। ওটা বোধ হয় ওঁর মুদ্রাদোষ। এমন কিছু বুড়ো

উনি হন নি যে কথা বলতে গেলে মাথাটা কাঁপবে। তবু কাঁপে, কারণ আদমজী খুব বুঝে সুঝে কথা বলেন। যে কথাটি বেরোয় ওঁর মুখ থেকে, তা যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি সমীচীন। সমীচীন কথাগুলি তিনি সমন্বয় সহকারে বলতে লাগলেন—কিন্তু গৃহস্থকে অনিকেত হতে বলা হয় নি গীতায়। গৃহস্থের গৃহ থাকবে, গৃহ ছাড়া গৃহস্থ কেমন ব্যাপার! ঘর সংসার ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়ানো কি চাট্টিখানি কথা! ঐ যে দেখলেন না ওদের দশা, দরিয়ার মধ্যে দ্বীপে পড়ে আছে। ওদেরও খাজনা দিতে হয় না, কোনও বন্ধন নেই। চাষ করতে হয় না, জল কাদার ভেতর ধান চাট্টি ছড়িয়ে দেয়! জল যত বাড়ে, ধান গাছও তত উঁচু হয়। কিছু দিন পরে ধানের ছড়াগুলো ছিঁড়ে নেবে। হয়ে গেল ওদের বেঁচে থাকার জন্যে খাটাখাটুনি করা। ওরা হল বিশুদ্ধ ইরানা। আসল আর্য। জরথুস্ত্র আবস্তার নামও কখনও শোনে নি। দেখুন কি দশা!

পরমানন্দজী আমার চোখের পানে তাকালেন, কি যে বোঝাতে চাইলেন ধরতে পারলাম না। আমার মুখ থেকে আর রা বেরল না। ওরা হল ইরানী! কি কাণ্ড দেখ! ঘুরতে ঘুরতে হতভাগারা কোথায় এসে জুটেছে! কেন, অতবড় দেশটার শহর গাঁয়ের ধারে কাছে দিব্যি তো পড়ে আছে ওদের জাত বেরাদাররা। মেয়ে পুরুষে নানা জাতের ছোরাছুরি ফিরি করছে, লোক ঠকাচ্ছে, হাতের কাছে পেলে ছিঁচকে চুরিও যে না করে তা নয়। কিন্তু সেখানে তো ওরা মরে বেঁচে নেই। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করে মনুষ্য জন্ম ভোগ করা কি মর্মান্তিক কর্মভোগ। চলুক ওরা ঐ দ্বীপের মুখে ঝাঁটা মেরে। আমরা গৃহস্থরা জন্ম জন্ম ওদের অত্যাচার সইব। তবু ওদের ওভাবে পড়ে থাকতে দেওয়া যায় না।

আদমজী পদমভাই আমার মনের কথাটা যেন টের পেয়ে গেলেন।

বললেন—ওদের আমরা ওখানে ফেলে রেখে এলাম। আমাদের মন খারাপ হচ্ছে। ওরা কিন্তু বেশ আছে। ওরা নিজেরা জানে না ওদের কি দুঃখ। ঐ দ্বীপে নেমে অনেকটা ওপরে উঠলে দেখতে পেতেন ওদের ঘর বাড়ি। বড় বড় খুঁটি পুঁতে অনেক উঁচুতে মাচা বেঁধে থাকবার ঘর বানিয়েছে ওরা। সে সব ঘরে হারমোনিয়াম দেখতে পাবেন, গ্রামোফোন দেখতে পাবেন। গান ওদের মজ্জাগত নেশা। ধান চাল থেকে মদ বানিয়ে নেশা করে, গান গায়, আর মেয়ে মানুষের জন্যে এ ওর খুন নেয়। ওদের মগজে অন্য কোনও মতলব গজায় না। দিন দিন ওরা বাড়ছে, দেশ-বিদেশ থেকে ছেলে মেয়ে চুরি করে আনছে। জোয়ান-জোয়ানীদের ফুসলে আনছে। একবার যে পড়বে ওদের পাল্লায়, তার আর নিস্তার নেই। সে সব ভুলে যাবে, ঘর বাড়ি আত্মীয় স্বজন শিক্ষা সভ্যতা বংশ পরিচয় কিছুই তার খেয়াল থাকবে না। মজে যাবে ওদের সঙ্গে, মানুষ হয়ে বেঁচে থেকে মানুষের ধর্ম মানুষের সমাজ মানুষের তৈরী আইন কানুন মানতে হবে না, এর চেয়ে মজা আর কি আছে।

রাত এগিয়ে চলেছে। নৌকা আর রাতে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে অনন্ত পানে। সাক্ষী রয়েছে অনেক উঁচুতে আকাশের নক্ষত্ররা। দক্ষযজ্ঞের সভা অনেকক্ষণ ভেঙে গেছে। যে যার শুয়ে পড়েছে জলটল খেয়ে। আমরা দুজনে জেগে আছি। কেন যে জেগে আছি, তাও ঠিক বুঝতে পারছি না।

আলোটা কমিয়ে মাথার কাছে বসিয়ে রেখেছেন ভৈরবী, মাথা কিন্তু তাঁর যথাস্থানে নেই। মানে ঘাড়ের ওপর মাথা নেই এ কথা

বলছি না। মাথাটি বালিশরূপী কাপড়ের পোঁটলাটার ওপর পড়ে নেই। সোজা হয়ে বসে আছেন তিনি. পনরো বিশ মিনিট অন্তর কট্‌কট্‌ করে সুপুরি কাটছেন আর মুখে ফেলছেন। অনেকক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইলাম। আশা করতে লাগলাম, এইবার পান মুখে দিয়েই ভৈরবী শুয়ে পড়বেন। কোথায় কি! খানিক পরে আবার কট্‌ কটাকট্‌ আওয়াজ।

বিরক্ত হয়ে উঠে বসলাম। যতদূর সম্ভব গলা খাটো করে রুখে উঠলাম—বলি, থামবে এবার! সবগুলো সুপুরি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত কি আজ রেহাই দেবে না।

ভৈরবী বললেন—এই পোড়ার-মুখো নৌকাখানা থেকে আমরা নামব কখন বলতে পারেন? কি ঝকমারি করে মরেছি নৌকায় চেপে, সব্বনেশে সুমুদ্দুরটা কি আর ফুরোবে না!

হকচকিয়ে গেলাম। নৌকার দেশের মানুষ, বহুকাল নৌকা চড়ে ঘুরতে পারেন নি বলে ওঁর মনে আক্ষেপের অন্ত ছিল না। করাচী থেকে কোটেশ্বর—ছ দিন ছ রাত নৌকাতে কাটাতে পারবেন শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়েছিলেন। নির্বিঘ্নে কাটলও তিনটে দিন নৌকায়, ঝড় ঝঞ্ঝা ডুবে মরার ভয়, কিছুই ওকে কাবু করতে পারলে না। হঠাৎ আবার হল কি!

বেমালুম বোকা বনে গেলাম। চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞাসা করলাম—হল কি আবার! বেশ তো আছি নৌকায়। ভাঙা ঘর জ্যোৎস্নার আলো, যে কদিন যায় সে কদিন ভাল। নৌকা থেকে নামলেই কাঁধে ঝোলা চড়বে। ঝোলার পাপ কাঁধ থেকে নেমেছে। কটা দিন। এত সুখ সইতে পারছ না বুঝি!

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন —আগুন দি এমন সুখের মুখে। না বাপু, সুখে আমার কাজ নেই। জন্ম জন্ম ঝোলা কাঁধে ঘুরে মরব মানুষ জনের সংসারে। সংসার-ছাড়া সৃষ্টি-ছাড়া সুখে আমার কাজ নেই।

বলবার আর কিছু রইল না। বহু দূরে নজর ফেলে দেখলাম, সমুদ্রের অন্তিম দশা সমুপস্থিত হয়েছে যেন। মরণাপন্ন পাণ্ডুর একটু আলোর আভা সমুদ্রের মুখে ফুটে উঠেছে। ওটুকু নিভে গেলেই হাঙ্গামা চুকে যাবে। চেনা জানা নিষুতি রাত কই! গুম মেরে বসে রইলাম কোনও একটা নিশাচর পাখির বুক কাঁপানো ডাক শোনার আশায়। পোকা-মাকড়ের ডাক শুনতে অভ্যস্ত কান হা হা করতে লাগল। কি হল! সব কিছু বন্ধ হয়ে গেল নাকি! বেঁচে যে আছি তার কোনও প্রমাণ পাচ্ছি না তো! সৃষ্টি ছাড়া অজানা অচেনা স্তব্ধতার গর্ভে তলিয়ে যেতে লাগলাম।

তন্দ্রা ছুটে গেল আমার। ভৈরবী আপন মনে বিড়বিড় করে বকছেন। কি বলছেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না। খুব জোরে নিজের মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি বলছ! মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! নিজের মনে বকে মরছ কেন?

এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ে ভাবে জবাব দিলেন ভৈরবী—ঐ ওদের কথা বলছি, ঐ যে বুড়ো বুড়ী চলেছে আমাদের সঙ্গে, ওদের উদ্দেশ্য কি জানেন? ওরা ওদের একমাত্র ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কতদিন ধরে খুঁজছে জানেন। ষোল বছর, ষোল বছর ধরে ওরা দু জনে ঘুরছে। ষোল বছর আগে ওদের ছেলে চুরি গেছে। ওদের ধারণা, ইরানীরা তাকে চুরি করেছে।

ইরানীদের আড্ডায় আড্ডায় ঘুরছে ওরা। ঐ দ্বাপটা, ওটাতেও ওরা তিন চার বার এসেছে থেকেছে। কোথায় যায় নি ছেলের খোঁজে! সেই চট্টগ্রামের ওধারেও গেছে। আহা রে, ছেলে খুঁজতে খুঁজতে ওরা বুড়ো হয়ে গেল।

তা গেল। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম আবার। পার্শী বুড়ো বুড়ীর ছেলে হারানোর শোকে নয়, অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম আর একটা কথা চিন্তা করে। ওরা বুড়ো হচ্ছে ছেলে খুঁজতে খুঁজতে, আমরা কি খুঁজে ফিরছি! কি যে খুঁজছি, তা আমরা নিজেরাও জানি না। হারানো ছেলেকে খুঁজে পেলে ওদের ঘোরাঘুরির শেষ হবে। আমাদের যে কিছুতেই এই বাউণ্ডুলেপনার শেষ হবে না, ঘুরে আমরা মরবই চির-কাল, কারণ আমাদের কিছু খুঁজে মরবার গরজটুকুও নেই। হায়-রে হায়, আমাদের চেয়ে বিশুদ্ধ ইরানী আর কোথায় কে আছে!

॥ নয় ॥

আর কত দুর!

জন্ম লাভ করছে ঐ এক প্রশ্ন, এ ওকে ও তাকে ছুতোয় নাতায় শুধচ্ছে—আর কত দেরি?

যে যেমন ভাবে পারছে জবাব দিচ্ছে। জবাবটি দিয়েই খুব মনমরা হয়ে যাচ্ছে। খানিক বাদে আর একজনকে সামনে পেয়ে বলছে—খুব সম্ভব কাল সন্ধ্যা নাগাদ আমরা নামছি, কি বল? যে

বলবে, সে খুব বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়ে বলছে—মনে তো তাই হচ্ছে, হাওয়াটা যদি ঠিক এই ভাবে থাকে তা হলে গুরুজীর কৃপায়—।

গুরুজীর কৃপায় সবাই সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে নিয়ে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছে। হাওয়ার মর্জি আর সমুদ্রের মর্জি, দু দুটো প্রকাণ্ড মর্জির কাছে অকপটে আত্মসমর্পণ করেছি আমরা কটি জীব। জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ আমরা, আমরা কথা বলতে পারি। কথার দ্বারা যতটুকু সান্ত্বনা লাভ করা সম্ভব আমরা তার চেষ্টা করছি। কথা দিয়ে তো আর সমুদ্রকে বা হাওয়াকে বশ মানানো যাবে না, নিজেদের বশ মানানো সম্ভব। তাই করছি, ধৈর্যের রজ্জুকে মুখের মধুতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে টেনে বাড়াবার চেষ্টা করছি, রজ্জুটি যেন ছিঁড়ে না যায়।

ছেঁড়বার উপক্রমই হয়েছে।

করাচী থেকে কচ্ছ, ব্যবধানটুকু পার হতে অযথা সময় লাগছে। অপচয় হয়ে যাচ্ছে জীবনের কয়েকটা দিন, সময় পালিয়ে যাচ্ছে। সময়কে পরাস্ত করতে হবে, সময়ের আগে দৌড়ে সময়কে দাঁত ভেঙচাতে হবে। করাচীর কূল থেকে নৌকা যখন ভাসল তখন সেখানে যে সময়টা ছিল সেই সময়টাকে ঠিক সেইখানে দাঁড় করিয়ে রেখে তৎক্ষণাৎ এক দৌড়ে যদি আমরা পৌঁছতে পারতাম কচ্ছ, তা হলে সময় বাবাজী অপদস্থের একশেষ হত। তা হল না, হতভাগা সময়ও অলক্ষিতে চড়ে বসল নৌকায় আমাদের সঙ্গে, ভাসতে লাগল সাগরে। ভাসছে, সমানে ভেসে চলেছে। দিন ফুরচ্ছে রাত আসছে। রাত ফুরচ্ছে দিন আসছে। সময়টা যেন ছিনে-জোঁক, কিছুতে

আমাদের ছাড়বে না। একটা যদি কোনও উপায় থাকত! যদি আমরা নৌকা সুদ্ধ সময়টাকে সাগরের বুকে ফেলে রেখে ঝপ করে গিয়ে নামতে পারতাম কচ্ছের কূলে তা হলে দেখতাম ওর দশাটা কেমন দাঁড়ায়। উপায় যে নেই তাই সময়ের সাহচর্য সহ্য করছি। কিন্তু ধৈর্যেরও সীমা আছে। ধৈর্যকে ধরে টানাটানি করে বাড়ানো হচ্ছে, বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত না ছিঁড়লে বাঁচি।

প্রত্যেকের মুখ অন্ধকার। সবাই যেন মুখোশ পরে ফেলেছে। চোখ বুজে নিজের মুখ পানে তাকিয়ে দেখছি মুখখানা পেঁচা-মুখ হয়ে উঠেছে। পেঁচা-মুখ নিয়ে কারও সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। পেঁচা-মুখের ভাষাটা হয়তো পেঁচার ভাষা হয়ে দাঁড়াবে। কৈকেয়ীনন্দন মিশ্র মহারাজের গোঁফ দেখে আর মনের মধ্যে সমীহ জাগছে না। গোঁফ যদিও আর গোঁফ নেই, মুড়ো ঝাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে তবু সেই গোঁফ দেখে কারও প্রাণেই হাস্যরসের উদয় হচ্ছে না। মিশ্রজী তাঁর চোখ আর ভুরুর সাহায্যে গোঁফ-বিহীন মুখে এমন একটা জিঘাংসার আগুন জ্বালিয়ে রেখে দিয়েছেন যে কার সাধ্য সে মুখ পানে চোখ তুলে তাকায়। সে আগুনটাও গেছে নিভে। মিশ্রজী কেমন যেন কুঁজো হয়ে গেছেন। ভয় ভক্তি দূরের কথা, ওঁর পানে তাকিয়ে খানিকটা করুণার উদয় হল মনে। হঠাৎ যেন বেচারা একদম গো-বেচারা হয়ে গেছেন।

জমশেদ্ সাহেব আবার সেই নৌকার লেজ ধরে বসেছেন। কাছাকাছি যেতে প্রবৃত্তিই হল না। কোথাকার কে একটা চাটগেঁয়ে মেয়ের জন্যে নাকে-কান্না কাঁদতে শুরু করবে, ন্যাকাপনার চূড়ান্ত। মেয়ে যেন আর নেই দুনিয়ায়, সেই একমাত্র কন্যের জন্যে জীবনভোর

নৌকার লেজে আটকে তপস্যা করতে হবে। বিরহী যক্ষ যার নাম—কাব্যি আর কাকে বলে। মার ঝাড়ু—

পরমানন্দজী শুধু হাঁটছেন। নৌকার আগাপাস্তলা পায়ে পায়ে জরিপ করছেন তিনি। মাথা নুইয়ে অল্প একটু সামনে ঝুঁকে হাত দুখানা পিঠের ওপর রেখে নৌকার ধারে ধারে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। অন্যমনস্ক হলেই বিপদ, দড়ি-দড়ায় আটকে হোঁচট খাবেন।

হোঁচট খেলেই মুশকিল কিন্তু হোঁচট আমরা অনবরত খাচ্ছি। জন্ম থেকে মৃত্যু—এই সময়টা হচ্ছে কতকগুলো হোঁচটের সমষ্টি। হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে সামলে যাওয়া আবার খানিক হেঁটে ফের একটি হোঁচট খাওয়া, ফের সামলে ওঠা আর এগিয়ে যাওয়া—এর নামই হচ্ছে বেঁচে থাকা।

মরণটাও হল ঐ হোঁচট। সে মোক্ষম হোঁচটটির পরে আর সামলাতে পারব না—সেইটেই হচ্ছে শেষ। ঐ মোক্ষম হোঁচটের নাম হচ্ছে মৃত্যু। তার পর আর হোঁচট নেই।

হোঁচট সম্বন্ধে আর ভাবা গেল না, অকস্মাৎ পরমানন্দজী সত্যি সত্যিই হোঁচট খেলেন। সামলে উঠলেন নৌকার পাড় দু হাত ধরে ফেলে, তার পর হাঁটা বন্ধ করে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

সমুদ্র তখন সাজগোজ করছেন। সারাটা দিন হাড় ভাঙা খাটা-খাটুনির পর কার না একটু ফিটফাট হতে শখ হয়। তাই উনি সর্বাঙ্গে সামান্য লালচে রঙের পাউডার ছড়াচ্ছেন। তার পর বেরিয়ে পড়বেন। শিস্ দিতে দিতে যাত্রা করবেন ওঁর হৃদয়েশ্বরীর উদ্দেশে, যাবার সময়

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যাবেন। তার পর আমরা অন্ধকারে থাকব, যতক্ষণ না বাবু ফিরছেন অভিসার থেকে ততক্ষণ আমাদের আলোর মুখ দেখার উপায় নেই।

সমুদ্রের হৃদয়, সেই হৃদয়ের হৃদয়েশ্বরী, সেই হৃদয়েশ্বরীর উদ্দেশে সমুদ্রের অভিসার যাত্রা। সমস্ত ব্যাপারটা সাজিয়ে গুছিয়ে মেলাতে গিয়ে খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। অন্যমনস্ক হয়ে কখন যে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছি পরমানন্দজীর পাশে, দাঁড়িয়ে সমুদ্রের অভিসার সজ্জা দেখছি একদম টের পাই নি। টের পেলাম পরমানন্দজীর ফিসফিসিনি কানে যেতে। সমুদ্রের সঙ্গে উনি কানে কানে আলাপ করছেন। আমি কান পাতলাম।

এই স্পন্দন, অবিরাম এই আলোড়ন, কোথায় এর শুরু! এর শেষই বা কোথায়! কি সেই মহাশক্তি যার প্রভাবে সমুদ্র থেমে থাকতে পারে না, সময় পালিয়ে যায়, দিনের পর রাত রাতের পর দিন অবিরাম পাক খেয়ে ঘুরে মরে!

সেই মহাশক্তি লুকিয়ে আছে তোমার হৃদয়ে, তোমার জানা আছে সেই মহাশক্তির রহস্য। যদি তুমি একটি বার তোমার হৃদয়ের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখতে!

সমুদ্রের হৃদয়-রহস্য জানতে চাইছেন পরমানন্দজী। চুপি চুপি সরে এলাম ওঁর পাশ থাকে। মানুষটার মাথার ঠিক নেই। পাগলের প্রলাপ কে কাঁহাতক শুনবে।

আদমজী পদমভাই তাঁর শয্যার ওপর উবু হয়ে বসে আছেন। ভারি ভাল লাগল, বৃদ্ধের ওপর ভেতর এক রকম। হাঁকু পাঁকু নেই,

হাপিত্যেশ নেই, সর্বরকমের চাওয়া পাওয়ার নাগালের বাইরে পৌঁছে স্পন্দনটুকুও উনি বর্জন করেছেন। একদম দম ফুরিয়ে থেমে গেছে যেন যন্ত্রটা, অপেক্ষা করে আছে দম দেবার লোকটি এসে দম দেবে, তখন আবার চলবে। আকাশ বাতাস সমুদ্র সময় চলুক যেমন চলছে, ওঁর কোনও সম্বন্ধ নেই চলমান সৃষ্টির সঙ্গে। সৃষ্টিছাড়া হয়ে বেঁচে আছেন, স্পন্দন ওঁর ধারে কাছে পৌঁছতে পারছে না।

আস্তে আস্তে গিয়ে ওঁর সামনে বসে পড়লাম। তাতে ওঁর একটুও ভাবান্তর ঘটল না। যেমন ভাবে বসে ছিলেন, তেমনিই রইলেন।

আদিম অনাবৃত অশোভন আলাপটাই মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ল ---আপনি তো বহুবার এই পথে আসা যাওয়া করেছেন আদমজী, কি রকম বুঝছেন ? কাল বিকেল নাগাদ কি আমরা পৌঁছে যাব ?

বৃদ্ধের ঠোঁট-দুখানি শুধু নড়তে লাগল। শুনলাম—ধরুন, এই যে রাতটা আসছে এটা আর ঠিক সময় শেষ হল না। রাত গড়িয়েই চলল। তাহলে ধরুন, যখনই আমরা পৌঁছই না কেন, এই রাতের মধ্যেই পৌঁছব।

একদম বোবা বনে গেলাম জবাবের মত জবাব পেয়ে। উৎকট কল্পনা, কিন্তু চরম সত্যি কথা। সত্যই যদি ঐ অঘটন ঘটে বসে, রাতটা আর না পোহায়, তাহলে এই রাত থাকতেই আমরা পৌঁছে যাচ্ছি। রাত যে পোহাবার সময় পোহাবেই, এমন অঙ্গীকার-পত্র কে লিখে দিয়েছে !

আদমজী অল্প একটু সামনে ঝুঁকে আরও চাপা গলায় বলতে লাগলেন—একটানা দিন অথবা একটানা রাত কিংবা দিনও নেই রাতও নেই একটানা একটা সময়, এমনি ধরণের একটা কিছু মেনে

নিলেই হাঙ্গামা চুকে যায়। তার পর সকালে পৌঁছব, না বিকেলে পৌঁছব, না আবার রাত পোহালে পৌঁছব, এই সমস্ত বাজে প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরতে হয় না। আরও এক কাণ্ড ঘটতে পারে। ধরুন—হাওয়া উল্‌টো দিক থেকে বইতে লাগল, নৌকাখানা উল্‌টো দিকে চলতে শুরু করল, সঙ্গে সঙ্গে সময়টাও পেছন দিকে ফিরে চলল। ফল হল এই, যে সময় যেখান থেকে আমরা রওয়ানা হয়েছিলাম, ঠিক সেই স্থানটিতে আবার আমরা উপস্থিত হলাম। এই রাত কটা আর দিন কটা স্রেফ মুছে গেল, এতটুকু লোকসান নেই।

তা নেই। লোকসানটা শেষ পর্যন্ত মস্ত বড় লাভে দাঁড়িয়ে যেতে পারে যদি সময়টা আরও খানিক পিছিয়ে যায়। পিছতে পিছতে একদম যদি না থামে সময় তাহলে কি হয়! যে মুহূর্তটিতে পৃথিবীর বুকে পদার্পণ করেছিলাম, সেই মুহূর্তটিও পার হাওয়া যায়। তার পর জন্মাবার আগে যা ছিলাম, যেখানে ছিলাম, যে ভাবে ছিলাম, জানা হয়ে যায়।

খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু সময়টা কি সত্যিই উল্‌টো দিকে বইতে শুরু করবে!

অসম্ভব নয়, কিছুই অসম্ভব নয়। জন্মে পর্যন্ত দেখছি, সময়-সমুদ্রে ভাঁটার টান চলেছে। হঠাৎ উজানের টানও তো শুরু হতে পারে। উজান ভাঁটি, ভাঁটি উজান, উজান ভাঁটি, চমৎকার। হে সময়ের সৃষ্টি-কর্তা, দোহাই তোমার, একটিবার দয়া করে উজানে বইতে আজ্ঞা করো প্রভু তোমার সময়কে। মজার মজাটা একটি বার চেখে নি।

কি ভাবছেন? ভাবছেন বোধ হয়, সময় কি আবার পিছতে পারে। মনে করছেন, বুড়োটার ভীমরতি ধরেছে। আদমজীর গলার

স্বর হঠাৎ যেন জেগে উঠল, প্রতিটি বাক্যের ওপর অযথা জোর দিয়ে তিনি উচ্চারণ করতে লাগলেন—সময় পিছিয়ে যায়। সময় পিছিয়ে গিয়ে ঠিক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে, তার প্রমাণ চান ? বহুবার এই ঘটনা আপনার জীবনেও ঘটেছে, বহুবার ঘটবেও। ধরুন—

'ধরুন' কথাটা হল আদমজীর মুদ্রা-দোষ। ধরুন বলে একটু থামেন উনি, তার পর যা ধরতে হবে তা শুরু করেন। আদমজীর কথা-গুলি খুব সাবধানে একটি একটি করে ধরে ফেলতে হয়। ফসকালেই মুশকিল, একটি বারের বেশী ছুটি বার এক কথা ওঁর মুখ দিয়ে বেরবে না। অতএব ধরতে লাগলাম। ধরতে ধরতে যা দাঁড়াল তা কস্মিন-কালে ধারণাও করতে পারি নি। সত্যিই তো ও রকম কাণ্ড ঘটেছে। অনেকটা সময় পিছিয়ে গিয়ে এক জায়গায় আটকে গেছে। কোনও একটি বিশেষ ঘটনা, একটা বিশেষ জাতের অনুভূতি, এক জনের সঙ্গে এক জায়গায় মন-দেওয়া-নেওয়ার একটি খুব বাঁকাচোরা অনুষ্ঠান, একটা সুতীব্র বেদনা বা একটা সুমহান আত্মত্যাগ, ঐ রকমের কোনও কিছু অবলম্বন করে অনেকবার অনেকটা সময় পিছিয়ে গেছি। আটকে থেকেছি বহুক্ষণ সেই অনেক পিছনের সময়টুকুতে। তার পর আবার একসময় চলা শুরু হয়েছে সময়ের সঙ্গে পা ফেলে। উজানের স্রোত আবার ভাঁটিতে বইতে শুরু করেছে। আশ্চর্য ব্যাপার! সময় যে সত্যিই পিছতে পারে, পিছিয়ে গিয়ে এক জায়গায় আটকে থাকতে পারে, এটা কেন আগে টের পাই নি!

আদমজীর কথাগুলো ধরতে ধরতে জানি না কখন কেমন করে সময়ের সঙ্গে উজানের টানে পিছিয়ে যেতে লাগলাম। পিছতে

পিছতে আসলাম আদমজীর সঙ্গে, আটকে গেলাম এক জায়গায়। আদমজা এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখাতে লাগলেন।

কি চাও তুমি ?

সেটা আমি জানাব কাজ শেষ করে।

না, আগে বল কি দিতে হবে। আগে কথাবার্তা ঠিক হওয়া ভাল।

না, আমার যা নেবার কাজ শেষ করে নোব।

তা দিতে পারব কি না, আমি জানতে চাই। হয়তো তখন তুমি অসম্ভব কিছু দাবি করে বসবে। হয়তো এত টাকা চেয়ে বসবে যা দেবার সামর্থ নেই আমার। যা দিলে আমাকে পথে বসতে হবে।

টাকা কড়ি ধন দৌলত তোমার কাছ থেকে আমি চাইবও না, নোবও না। তুমি কি মনে কর, টাকার জন্যে আমি এ কাজ করতে যাচ্ছি ? টাকার বদলে এ কাজ করা যায় ?

টাকা নেবে না তাহলে ?

ভয় পাচ্ছ কেন। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, টাকা আমি নোব না। টাকা দিয়ে যা কেনা যায়, এমন জিনিস আমি নোব না। তোমার বাড়ি ব্যবসা মান ইজ্জত সব বজায় থাকবে। তোমার দুশমন শায়েস্তা হবে। আমি আমার পাওনা নিয়ে বিদায় হব। জীবনে আর কখনও আমার মুখ দেখতে পাবে না। বিশ্বাস কর আমার কথা। আমরা লোক ঠকাই, ভেল্‌কি দেখিয়ে পেট চালাই। কিন্তু কথা দিয়ে কথার খেলাপ করি না। ইরানী মেয়ের মান নেই, ইজ্জত নেই, ঘর বাড়ি মাথা গোঁজবার স্থান এমন কি মা বাপের পরিচয় পর্যন্ত নেই। কিন্তু

একটা জিনিস আছে। ইরানী মেয়ে কখনও কাকেও কথা দেবে না। আর যদি দেয় কখনও কথা, সে কথা সে রাখবেই। কিছুই আমাদের ঠিক নেই কিনা, তাই জবানটা ঠিক থাকে। জবানটা যে মুখের ভেতর আছে, ওটাকে কি বদলানো যায়!

আচ্ছা—যাও। সামর্থে যদি কুলোয়, তুমি যা চাইবে তা দোব। আমার জবানও ঠিক থাকবে। কাজ শেষ করে এসো।

ঘাঘরায় একটা চক্কর লাগিয়ে মাথায় বাঁধা রুমালখানায় ঢেউ তুলে পিঠে ঝোলানো বেণীটা দিয়ে এক ঝাপ্‌টা লাগিয়ে ইরানী মেয়ে হাওয়ার আগে উড়ে চলে গেল। সামনে দাঁড়িয়েছিলেন যে দীর্ঘদেহ পুরুষটি সে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল।

ভয়ানক রকম চমকে উঠলাম। স্বয়ং আদমজী পদমভাই বুড়ো হবার আগে উনি যেমনটি ছিলেন। হাঁ, হুবহু মিলে গেল। একই লোক, অনেকটা সময় পিছিয়ে গেলে উনি আবার ঠিক ঐ রকমই হবেন। কিন্তু পিছিয়ে কি উনি যেতে পারবেন!

পরের দৃশ্য।

আদমজী, ওঁর স্ত্রী, আর ওঁদের পাঁচ ছ বছরের একটি ছেলে। পরম শান্তি, চরম তৃপ্তি, নরম আব্‌হাওয়া বইছে। চিরদিনের শত্রু নিপাত গেছে। লোকটা ছিল ভণ্ড জোচ্চর—যতদূর সম্ভব হাড়ে হারামজাদা। অনবরত টাকা নিঙ্‌ড়ে বার করেছে আদমজীর কাছ থেকে। তার মুখ বন্ধ করার জন্যে রাশি রাশি টাকা তাকে ঘুষ দিতে হয়েছে। যতদিন বেঁচে থাকত, ঐ ভাবে শুষে নিত। আপদ গেছে, হতভাগা তার লাম্পট্যের ফল হাতে হাতে পেয়েছে। ফুর্তি মারতে

গিয়েছিল ইরানী মেয়ের সঙ্গে, বুকে ছোরা বেঁধা পড়ে আছে সমুদ্রের ধারে। বোম্বাই শহরে যেখানে যত ইরানী ছিল, সব উধাও। শহরের কোথাও ইরানীদের একটা তাঁবু নেই।

শেষ দৃশ্য।

আদমজী অস্থির হয়ে উঠেছেন। আসছে না কেন সে, তার বকশিস নিয়ে যাচ্ছে না কেন! কবে আসবে সে! কি জানি কি চেয়ে বসবে!

কি হল! কি বললে তুমি! একটা ইরানী মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের খুব ভাব হয়ে গেছে! রোজ সেই মেয়েটা আসে! তোমার ছেলেকে নিয়ে খেলা দেয়! গেটের বাইরে বসে সেই ইরানী মেয়ের সঙ্গে তোমার ঐ অতটুকু ছেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকবক করে! কেন এত দিন বল নি আমাকে? যাও, শিগগির ডেকে আন ছেলেকে। আমি জানতে চাই, কখন সে আসে। সেই ইরানী মেয়ের সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই।

আদমজী দাঁড়িয়ে রইলেন। ওঁর স্ত্রা ছেলে আনতে গেলেন।

তার পর—

আদমজী দাঁড়িয়েই আছেন। পাথরের মত হয়ে গেছেন যেন। নড়ছেন না, চোখের পাতা পর্যন্ত পড়ছে না। কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না যেন। ওঁর স্ত্রী ওঁর পায়ের সামনে পড়ে আছাড় পিছাড় খাচ্ছেন।

এনে দাও আমার ছেল্লেকে। আমি ভুল করেছি, বুঝতে পারি নি যে সেই সর্বনাশী আমার ছেলেকে চুরি করবে। বুঝতে পারি নি বলে

তোমায় জানাই নি। আমার ভুল, আমার কসুর, আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ছি। আমার ছেলে খুঁজে এনে দাও।

অতীতের গর্ভ থেকে উদ্ধার করে আবার সাগরের বুকে নৌকার ওপর নিয়ে এলেন আমায় আদমজী পদমভাই। এনে বললেন—ঐ জায়গাটায় আমি আটকে আছি, আমার সময় এগোয় না পেছয় না। আমি কি করে বলব, এই নৌকা কবে কোথায় গিয়ে ভিড়বে। ভিড়ুক না ভিড়ুক, আমার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আমার সময় পালিয়ে যায় না। সময়ের হাত থেকে পালাবার জন্যে আমিই ভেসে বেড়াচ্ছি। ছেলের মা সঙ্গেই রয়েছেন। ওঁর ছেলে ওঁকে দিতেই হবে ফিরিয়ে, ফিরিয়ে দিতেই হবে।

॥ দশ ॥

সময় মাপার মেয়াদ ফুরিয়ে এল। হল শেষ ভেলায় ভেসে থাকা। জঘন্যতম শত্রুর পানে তাকায় যে ভাবে মানুষে, সেই ভাবে নৌকাখানার পানে তাকিয়ে আছে যাত্রীদল। ওর অপরাধ, ও আমাদের বন্দী করে রেখেছে। কটা দিন কটা রাত আমরা আমাদের মর্জি মাফিক দুই ঠ্যাং চালিয়ে ধরিত্রীর বুকে দাপাদাপি করতে পারি নি। কি স্পর্ধা! কয়েকখানা মরা কাঠ, কয়েক শ লোহার গজাল আর এক রাশ দড়াদড়ি সুদ্ধ খান কতক নানা মাপের পাল, সবই মানুষের হাতে গড়া, মানুষের খেয়াল-খুশি মত বানানো। কিন্তু প্রতাপ কত! নাস্তানাবুদ করে ছাড়লে মানুষকে! রাতের পর দিন, দিনের

পরে রাত এল গেল। আমরা জলজ্যান্ত কটা মানুষ নেহাত নাচার হয়ে ঐ মরা কাঠের গর্ভে মর মর হয়ে রইলাম। কর্মের ফেরে পড়া আর কাকে বলে!

কর্মের ফের অথবা সময়ের ফের, যার ফেরেই পড়ে থাকি না কেন শেষ পর্যন্ত কিন্তু ধৈর্যটুকু টিকে ছিল সকলের। ছিল ঐ নির্লজ্জ সমুদ্রটার জন্যে। বেহায়াপনা কাকে বলে! একমাত্র জবাব হল সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার নাম বেহায়াপনা। গান বল, নাচ বল, খুব ভাল কোনও সৎকথা বল, সবই ঐ বেহায়াপনায় দাঁড়িয়ে যায় যদি থামবার জায়গাটিতে না থামতে পারে। সমুদ্রের হল ঐ দশা, ওর মহিমা ওর বিপুল বিশালত্বে। কিন্তু তারও তো একটা সীমা থাকা উচিত। নেই বলেই ঐ সমুদ্রটাকে নিয়ে সমুদ্রের মত আদিখ্যেতা করা পোষায় না। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আর ওর মত অসহায়তা ভোগ করতে করতে মন মেজাজ এমন খিঁচড়ে উঠল যে ওকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু মাত্র প্রয়োজন বোধ করলাম না। শেষ হবেই এক সময়, দেখাই যাক ওর দৌড় কতদূর। নির্ঘাৎ এক সময় দেখা যাবে যে ওর বেহায়াপনা ঘুচেছে, মাথা খুঁড়ে মরছে মাটির ধরণীর পায়ের ওপর। সেই দৃশ্যটি দেখতে পাব যখন তখন ওর দিকে পেছনে ফিরে সোজা হেঁটে চলে যাব। ওর দুর্দশা দেখবার জন্যেও একটি বার পেছনে ফিরে তাকাব না।

তাই-ই হল।

ঝাড়া পাঁচটা দিন আর ছটা রাত কাটল, ছবার উদয় আর ছবার অস্ত গেলেন সুয্যি ঠাকুর। তার পর আমরা শুনতে পেলাম যে আর একবার অস্ত যাবার আগেই আমরা ঠিক ঠিকানায় পৌঁছচ্ছি। শুনলাম

যখন তখন অবশ্য পৌঁছনো না পৌঁছনো সম্বন্ধে কেমন যেন একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব এসে গেছে চিত্তে। একদিন না একদিন এক সময় না এক সময় পৌঁছবই যে এ তো জানা কথা। সুতরাং জানা কথাটা জানতে পেরে কিছু মাত্র ভাবান্তর ঘটল না। ধীরে সুস্থে যে যার মাল-পত্র গোছগাছ করতে লাগলাম।

বেহায়া দরিয়া তখনও ঠিক খোশামুদি করে মরছে। দিচ্ছে দোল দোদুল দোলায়। দিক, মনে আর দোলা লাগছে না। মনের সীমা আছে যে, মন তো আর সমুদ্রের মতন সীমাহীন নয়।

মনের শক্তি আছে দৌড়বার। সমুদ্রের সঙ্গ ত্যাগ করে মন গিয়ে পৌঁছে গেছে তখন ভৈরব কোটেশ্বরের চরণ প্রান্তে। দেবী হিঙ্গুলার ভৈরব কোটেশ্বর, কোটেশ্বর স্পর্শ করতে পারলে মহাপীঠ দর্শন ষোল আনা সুসম্পন্ন হবে। আর—যবনত্ব ঘুচবে।

যবনত্ব ঘোচাতে হলে লোহা পোড়ার ছেঁকাও খেতে হবে। পরমানন্দজী পরমানন্দে বাতলে দিলেন—ছোট্ট একখানি লোহার ত্রিশূল পুড়িয়ে রাঙা করে চেপে ধরবে শরীরে। যেখানে চাও, দাগ দিয়ে দেবে। কনুই থেকে কব্‌জির ভেতর নিতে পার, অনেকে দু হাতেও নেয়। কেউ কেউ নেয় বুকের ওপর। ঐ ছাপটিই হল প্রমাণ, হিংলাজ দর্শন করে কোটেশ্বর দর্শন করেছ, যবনত্ব ঘুচে গেছে, পুনর্জন্ম লাভ করেছ, তার প্রমাণ হচ্ছে ঐ ত্রিশূলের ছাপ। ঐ ছাপ দেহের সঙ্গে যাবে, হিংলাজ কোটেশ্বরের স্মৃতি আমৃত্যু মনে থাকবে।

শুনে ছ্যাঁক করে উঠল মন। বলে কি রে বাবা!

পরমানন্দজী বললেন—হ্যাঁ, ও ছাপ নিতেই হবে। ভৈরবনাথের আদেশ, না নিলে মহাপাতক হয়।

মহাপাতক হয়। তা হলে তো করেছে সর্বনাশ। ভৈরবী রাজী হয়ে গেলেন তৎক্ষণাৎ, মহাপাতক থেকে লোহা পোড়ার ছেঁকা ঢের ভাল।

আমি পড়লাম দারুণ সংকটে। ছেঁকা না নিলে যখন মহাপাতক হয়, তখন ছেঁকাটি না নিয়ে কি উপায়ে মহাপাতকটিকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব, তা জানতেই হবে। উপায় একটা না একটা ঠিক আছেই। শাস্ত্র হল অগাধ সমুদ্র-তুল্য ব্যাপার। যে শাস্ত্র পাপ কি তা বলে দিয়েছে, সেই শাস্ত্রই প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছে। প্রায়শ্চিত্তের অনুকল্পও ঐ শাস্ত্রেই আছে। অশক্ত পক্ষে বিধেয় বলতে কি কিছু নেই! নেই হতেই পারে না।

অনুকল্পের কথাটা তুলতে গেলাম পরমানন্দজীর কাছে, হিতে বিপরীত ঘটল। সদানন্দ পরমানন্দজী তেলে বেগুণে জ্বলে উঠলেন—কেন? অত বড় শরীরটায় একটু ছেঁকা লাগলে মরে যাবেন নাকি? হিংলাজ দর্শন করতে গিয়ে যে সুয্যপক্ক হয়ে এলেন, মরে তো যান নি। ও সব চলবে টলবে না, ছেঁকা নিতেই হবে।

মিন মিন করে বললাম—ছেঁকার জ্বালা ভাবছি না পরমানন্দজী, ভাবছি সেই আকখুটে দাগটার কথা। এখনও কত দিন বেঁচে থাকব, তা বলা মুশকিল। যতকালই থাকি না কেন এই দুনিয়ায় ঐ দাগটা বয়ে বেড়াতে হবে। এইখানেই মন সায় দিচ্ছে না। যবন হয়ে যাওয়া, যবনত্ব ঘোচাবার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করা, এই ব্যাপারগুলো মনে পড়ে যাবে। জীবন-ভোর আপ্রাণ চেষ্টায় ঐ প্রায়শ্চিত্ত কর্মটিকে এড়িয়ে চলেছি। পাপ যা করেছি এবং এখনও করতে পারছি সেগুলো নষ্ট করতে চাই না প্রায়শ্চিত্তের আগুনে। আহা-থাক। পুণ্য যখন একটিও অর্জন করতে পারলাম না, তখন পাপগুলো অন্ততঃ থাকুক।

ওগুলোকেও যদি খোয়াই, তা হলে শুধু-হাতে রওয়ানা হতে হবে যে, পাথেয় বলতে কিছুই যে সঙ্গে যাবে না।

ওটাও একটা মস্ত বড় ধাপ্পা—পরমানন্দজীর কণ্ঠে আবার সেই আমেজী টান ফুটে উঠল। চোখ দুটিতে দেখা দিল সেই খুশীর আলো। মাথা নেড়ে সাদা চুলে ঢেউ তুলে বললেন—পাপও সঙ্গে যাবে না, পুণ্যও সঙ্গে যাবে না। পাপ পুণ্য ভাল মন্দ কিছুই পাথেয় হবে না। যেখানকার যা সেখানেই থেকে যাবে। তার কারণ, কে কোথায় যাচ্ছে যে পাথেয় নিয়ে যাবে?

যেতে হবে না কোথাও! আঁতকে উঠলাম—তার মানে তীর্থ দর্শনের ফলে অমরত্ব লাভ ঘটে বসল নাকি!

কে বলেছে যে আপনি অমর নন? বাগে পেয়ে গেলেন পরমানন্দজী। একটু উচ্ছ্বাস ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে। আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বেশ একটু তীব্র দৃষ্টিতে আমার চোখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি যে মরবেন, এ কথা আপনাকে বলেছে কে? আপনি কি জন্মেছেন যে মরবেন? আপনার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। কোথাও থেকে আপনি আসেন নি, কোথাও যাবেনও না। আপনি আগেও ছিলেন, এখনও আছেন, পরেও এমনি থাকবেন। যা থাকবে না তার নাম স্পন্দন। স্পন্দনটুকু মাত্র বন্ধ হয়ে যাবে আপনার ঐ শরীরটায়। ওটা অকেজো হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে আপনি ওটা ছেড়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জোড়া স্পন্দনের সঙ্গে মিশে যাবেন। রইলেন মিশে কিছুদিন সেইভাবে, তার পর আবার একটা উপযুক্ত যন্ত্র পেয়ে গেলে তার ভেতর এসে স্পন্দিত হতে থাকবেন। সহজ ব্যাপার, এর মধ্যে আসা যাওয়াটা কোথায়?

ঐ উপমাটা একদম সস্তা হয়ে গেছে পরমানন্দজী।—যতদূর সম্ভব বিরক্তিটা চেপে জবাব দিলাম—জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করে নতুন বাস ধারণ—ওটা শুনে শুনে মানুষের কান পচে গেছে। ওটার সঙ্গে আরও রাশিকৃত উপদেশও শুনতে হয় কি না। এটা করো না, ওটা করলে পাপ হয়, সেটা হচ্ছে ভয়ানক রকম অন্যায়, এগুলোকেও গিলতে হয় কি না ঐ জীর্ণ বাস নতুন বাসের উপমার সঙ্গে।

পরমানন্দজী তৎক্ষণাৎ অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। দপ করে জ্বলে উঠে বলতে লাগলেন--ঠিক বলেছেন। ধড়িবাজরা ঐ পাপ পুণ্যের ভয় দেখিয়েই সবায়ের মন খিঁচড়ে দিয়েছে। পাপ নেই পুণ্য নেই, প্রায়শ্চিত্ত সাজা এ সমস্ত স্রেফ ধড়িবাজদের ধোঁকা-বাজী। সোজা কথাটা মানুষকে বুঝিয়ে বললেই হয়। একটা ঐকতান সঙ্গীত চলছে। পঞ্চাশটা যন্ত্র এক সুরে বাঁধা, পঞ্চাশ জনে হিসেব মত ঠিকঠাক বাজাবে। একজনের যন্ত্র বেসুরে বেজে উঠল, কিংবা একজন বেহালায় এমন এক বিদঘুটে টান দিয়ে বসল যে সঙ্গীতের ওপর খাঁড়ার কোপ পড়ল। ঐ কাজটি কি করা উচিত। এই পৃথিবী, এই পৃথিবীর আকাশ, তার পর মহাকাশ, সেই মহাকাশে কোটি কোটি নক্ষত্র, সেই নক্ষত্রগুলোর চন্দ্র সূর্য, এই যে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড, এই ব্রহ্মাণ্ডটা চলছে এক সুরে। যে যার নিজের কক্ষ পথে ঠিকঠাক ঘুরছে। ঠিকঠাক রূপ বদলাচ্ছে সব বস্তুর, জল বাষ্প হচ্ছে, বাষ্প জলে দাঁড়াচ্ছে। তাপ তুষার হচ্ছে, তুষার থেকে তাপ বেরচ্ছে। কেন হচ্ছে? সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে এই স্পন্দন চলছে কেন? সে স্পন্দনটা কি?

দম নিয়ে নিলেন পরমানন্দজী। নিয়ে চক্ষু বুজে বলতে লাগলেন

—সেই স্পন্দন আপনার ভেতরে চলেছে, আমার ভেতরে চলেছে, বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ঐ একটি মাত্র সত্য বস্তু—স্পন্দন। ঐ দেহটার মধ্যে যখন ঢুকতে পেয়েছেন তখন মন বুদ্ধিও পেয়েছেন। সেই মন বুদ্ধি দিয়ে ঐ স্পন্দনটাকে জানবার চেষ্টা করুন। শক্ত নয়; একদম বাইরের জিনিস নয়। যে মুহূর্তে আপনার ভেতরের স্পন্দনটাকে জানতে পারবেন, ধরতে পারবেন, সেই মুহূর্তে সেই বিরাট স্পন্দনের সঙ্গে মিশে যেতে পারবেন। তখন পাপও করবেন না পুণ্যও করবেন না। একটি মাত্র চেষ্টাই তখন করতে থাকবেন—যাতে সেই বিরাট স্পন্দনটি নিখুঁত ভাবে চলতে থাকে।

স্পন্দন যেখানে আছে, সেখানে ধ্বনিও আছে। সেই ধ্বনিটুকু নিয়ে সাধনা করতে হবে। ব্যাস—হাঙ্গামা হুজ্জত মিটে গেল। সেই ধ্বনি নিয়ে এমনই মেতে উঠবে যে কোনও দিকে নজর দেবার ফুরসত পাবে না। পাপ পুণ্য তখন করছে কে!

বিলকুল সব উত্তম কথা। মোদ্দা ঐ সাধনাটি করছে কে? স্পন্দন ধ্বনি এ সমস্ত যেমন নির্ঘাৎ খাঁটি বস্তু, তেমনি খাঁটি বস্তু আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আমাদের জেদাজেদি আমাদের জীবনটা নিয়ে জুয়া খেলার প্রবৃত্তি। শ্বাসটুকু যতক্ষণ আছে, তখন শাশ্বত সত্যি আমিও আছি। আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ আমার হক আছে দুনিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া করবার। চুলোয় যাক স্পন্দন এবং স্পন্দন-সম্ভূত ধ্বনি। ও সব বড় বড় ব্যাপার নিয়ে শিরঃপীড়া ঘটাবার মত শির সবায়ের স্কন্ধে নেই। সুতরাং পাশ কাটাবার চেষ্টা করলাম। বললাম—থাক এখন ও সব বড় কথা পরমানন্দজী। এবার তো পৌঁছে যাচ্ছি। এ ক'দিন সুখে

দুঃখে তো কাটল এক রকম। এখন বলুন আবার কবে দেখা হচ্ছে, কোথায় আবার দেখা পাব আপনার ?

সেই কথাটাই তো বলতে চাচ্ছি।—চোখ মেলে সামনে ঝুঁকে পড়লেন পরমানন্দজী। একটা যেন খুব উল্লেখযোগ্য ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, এই ভাবে ফিসফিসিয়ে বললেন—আবার দেখা হবে আশাপূর্ণার মন্দিরে। আপনারা ঐ পথ দিয়ে ফিরে যাবেন। কয়েক দিন থাকবেন মায়ের স্থানে, দেখবেন সেখানে কি হচ্ছে। তন্ত্র সাধনা মানুষকে কতখানি শক্তি দিতে পারে, তা স্বচক্ষে দেখে যাবেন।

আর একটু হলেই আবার জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম তত্ত্বজ্ঞানের জালে। শক্তি নিয়ে কচলাকচলি জোড়বার জন্যে জিভের ডগা সুড়সুড়িয়ে উঠছিল। ঐ শক্তিই একটু ভাঙিয়ে জিভটাকে শায়েস্তা করে ফেললাম। একটা কিছু বলতেই হয়। তাড়াতাড়ি দু হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললাম—সবই মায়ের কৃপা। মা আমাদের সর্বশক্তিরূপিণী। আহা—যাব বৈকি। নিশ্চয়ই যাব। গিয়ে মায়ের ভক্তদের চরণধুলো নিয়ে আসব।

তা হলে আর আপনাদের কষ্ট করে যেতে হবে না সেখানে! —বিষিয়ে উঠল আস্তে আস্তে পরমানন্দজীর সুর—ভক্ত ভক্তি ভণ্ডামি ভাঁওতা দেখতে হলে আপনার সেই বাঙলা দেশই সব থেকে ভাল স্থান। মা মা ম্যা ম্যা করে গান জুড়ে বুক ভাসিয়ে কেঁদে মল সবাই, নদীয়ার নিমাইচাঁদ ওদেশে ভক্তি আর প্রেমের ঢেউ বইয়ে দিয়ে গেছেন। ভাসুন গিয়ে সেই তরঙ্গের ওপর, হাবুডুবু খেয়ে মরুনগে। কেউ মানা করতে যাবে না। ও দেশে জন্মালেই আঁতুড় ঘরে মানুষের মনে প্রেম ভক্তির জোয়ার বয়ে যায়। না মশাই, ওসব চরণধুলো আর গড়াগড়ি

খাওয়া—আমাদের মায়ের স্থানে নেই। মাকে আমরা ভক্তি করি না, মায়ের নামে চোখের জলে বুক ভাসাই না। মা আমাদের পর নন যে মাকে খোশামুদি করে মরব। মাকে মা বলতে হয়, তাই বলি। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যিনি প্রসব করেছেন তিনি মা। যাঁর চৈতন্যে ব্রহ্মাণ্ড চৈতন্যময়, তিনিই চৈতন্যময়ী জননী। মা জননী এ সমস্ত না বললেও তাঁর কিছু যাবে না আসবে না। তাঁকে শালা বা শালীর বেটি শালী বললেই কি আসে যায়। জিভ কণ্ঠ স্বর বাক্য অক্ষর এই সমস্ত দিয়ে এমন কিছুই বানানো যায় না, যার দ্বারা মাকে বোঝানো যায়। তাই ঐ সহজ ডাকটা চালু হয়েছে—মা। মা যখন মা তখন ভক্তি করতে যাব কেন? ভক্তিটাও যে ঐ মা। তিনিই স্বাহা স্বধা বষট্ রূপা তাঁকে ঐ সব উদ্ভট মন্ত্র আওড়ে খোশামুদি করতে যাব কোন দুঃখে? মা কি খোশামুদির ধার ধারেন?

স্বাহা স্বধা বষট্ রূপা শুভাং পীযুষ-বাদিনীম্॥
অক্ষরাং বাজ-রূপাঞ্চ পালয়িত্রীং বিনাশীনীম্॥
ত্রিধা মাত্রাত্মিকাস্থাঞ্চ অনুচার্যাং মহেশ্বরীং।
মহেশ্বরীং মহামায়াং মাতরম্ সর্বমাতরম্॥

অ উ ম এই যে তিনটি মাত্রা, অ উ ম এই তিন মাত্রার সংমিশ্রণে ওঁ বীজ। ঐ যে মহাধ্বনি ওঁ, যা উচ্চারণ করা যায়, আর যা একেবারে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়, তাও ঐ তিনি। তিনিই মহামায়া, তাঁর মায়া থেকে এত কথা এত বাক্য এত নাম সৃষ্টি হয়েছে। তিনি মা, তিনি সব কিছুর মা। তাঁর কাছে হাউ মাউ করে গান গাইলেই বা কি হবে? তাঁর কাছে ভক্তির ভাঁওতা দেখালেই কি হবে? তার চেয়ে ঢের বড় কাজের কাজ হবে, তাঁর ঐ মায়াটি সম্বন্ধে কিছু জানতে চেষ্টা করলে।

সেই চেষ্টা যিনি করেন, তিনিই তান্ত্রিক। ভয় ভক্তি ভাব অভাব কিছুরই তিনি পরোয়া করেন না।

যাকে বলে চুটিয়ে বলা, সেই চুটিয়ে বলা বলে পরমানন্দজী দম ফেললেন। তর্কাতর্কি করার প্রবৃত্তি হল না। তর্কাতর্কি করার খুঁজেও পেলাম না কিছু। যে যেমন বোঝে, বুঝুকগে। বুঝে ফেলতে পারলে হাঙ্গামা চুকল। আর কিছু না হোক, এক রকম ভাবে বুঝে নিতে পারলে দ্বিধা সংশয়ের হাত থেকে নিস্তার মেলে। আর দ্বিধা সংশয় যেখানে নেই, সেখানে নিষ্ঠা আছেই। উৎকট ভক্তির তাড়নায় নিষ্ঠা আসুক বা বোঝাবুঝির ফলে নিষ্ঠা আসুক, নিষ্ঠাটি আসা চাই। নিষ্ঠাই হল শক্তি, ঐ নিষ্ঠা শক্তি প্রয়োগ করে যে শক্তি অর্জন করা যায়—তার নাম চৈতন্য শক্তি। চৈতন্য দ্বারা যা লাভ করা যায়, তার নাম চৈতন্যরূপিনী মা। তাই মা হলেন আদ্যাশক্তি। মায়া মহামায়া জ্ঞান চৈতন্য শক্তি, একটা ছাড়া আর একটা কিছুই নয়। অনেক বার অনেক রকম ভাবে ও সব শুনেছি, সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে নিজেও কপচাতে পারি খানিকক্ষণ। কিন্তু তাতে কি গেল এল! যে শক্তির তাড়নায় জ্ঞান চৈতন্য মায়া মহামায়া আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, পড়বার পরে কোনও দিকে না তাকিয়ে অভিষ্ট লাভের জন্যে ক্ষেপে উঠি, সেই শক্তিটিকে আয়ত্তে আনা যায় কি উপায়ে? ওটাকে যদি বাগ মানানো যায়, তা হলে আর ভাবনা কি? যার কোনও আশা নেই, অভীষ্ট নেই, হাহাকার নেই, সে তো রাজার রাজা। অভাব বলতে যার কিছুই রইল না, সে কেন সাধনা করে তকলিফ উঠাতে যাবে। কিসের সাধনা করবে সে?

করবে। তখনও সে সাধনা করবে। ভক্তিকে দু পায়ে মাড়িয়ে,

ভাবের ওপর শব বিছিয়ে তার ওপর চড়ে বসে শবাসনার সাধনা করবো শব হল এমন বস্তু যার মধ্যে স্পন্দন নেই। স্পন্দনটুকু গেল কোথায়, এটা জানতে হলে শবের ওপরেই চড়তে হবে। চৈতন্য অচৈতন্যের মাঝে একটি ছোট সাঁকো আছে, সেটি পেরোতে হবে।

পরমানন্দজী শবসাধনার গুহ্যতত্ত্ব বোঝাবার জন্য তৈরী হলেন।

বাধা পড়ল। শ্রীকৈকেয়ীনন্দন মিশ্র মহারাজের হুংকার শোনা গেল—জয় সীয়ারাম, ঐ ডাঙা দেখা যায়।

শবাসন নয়, কাষ্ঠাসন ছেড়ে তৎক্ষণাৎ খাড়া হয়ে দাঁড়ালাম। খড়-খড় খড়খড় আওয়াজ উঠল মাথার ওপর, মাস্তুলের ডগায় বাঁধা কপিকল ঘুরছে। পালগুলো নেমে পড়ছে একে একে। চঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি করছে সবাই। দড়িদড়ায় জোট পাকিয়ে যাচ্ছে।

দূরে অনেক দূরে একটা কালো রেখা। হাঁ তীর, নির্ঘাৎ ওটা মাটির ধরিত্রী। সমুদ্রটা ঐখানে পৌঁছে খতম হয়েছে।

## ॥ এগারো ॥

ডাঙা তখনও বহু দূর, চার চারটে প্রচণ্ড-দর্শন নোঙর ছুঁড়ে ফেলা হল সাগর-গর্ভে। তার পর আর এগোতে পারল না তরী, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ধেই ধেই করে নৃত্য জুড়ে দিলে। যতক্ষণ না ভাঁটা পড়বে ততক্ষণ ঐখানেই স্থিতি। ভাঁটা পড়বে, বালি-খালাস হবে, সাগরের রোখ কমবে, তখন অল্প জলে বালি-বিহীন হাল্‌কা নৌকাখানাকে টেনে হিঁচড়ে গিয়ে তোলা হবে ওপরে। জোয়ারের সময় আর এগোলে

নৌকা সামলানো যাবে না, বেয়াড়া দরিয়া বাগে পেলে মারবে আছাড় ডাঙার ওপর। দরিয়াকে কি বিশ্বাস করতে আছে!

চোখের সামনে মাটি। মাটি নয়, ছোট বড় নানা আকারের পাথরের চাঙড় পড়ে আছে দেড় শ দুশ হাত সামনে। চাঙড়গুলো বিকট মুখ করে আমাদের ভেঙ্‌চাতে লাগল। ডাল কড়াই কুলোয় তুলে ঝাড়তে শুরু করলে সেগুলোর যেমন অবস্থা হয়, সেই রকম দশা তখন আমাদের। কাপ্তেন সাহেবের কব্‌জির চেয়ে মোটা চার গাছা রশি ছিঁড়ে নৌকাখানাকে ডাঙার ওপর আছাড় মারবার সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের ওপর ঝাল ঝাড়তে লাগল দরিয়া। নৌকারূপ কুলোয় হতভাগ্য জীব কটাকে সজোরে আছড়াতে লাগল।

মাটি কামড়ে পড়ে থাকার মত নৌকার কাঠ কামড়ে পড়ে রইলাম আমরা। ওধারে শুরু হল বালি খালাস করার পালা। ঝোড়া বোঝাই করে খোল ভরতি বালি সাগর জলে ফেলা হতে লাগল। বেলা গড়িয়ে গেল, মাঝে মাঝে মুখ উঁচু করে দেখলাম পাড়ে কেমন ভিড় জমছে। স্ত্রী পুরুষ ছেলে বুড়ো বিস্তর জমা হয়েছে পাথুরে ডাঙায়, মাথার ওপর হাত তুলে উদ্দাম নৃত্য জুড়েছে অনেকে। মনে হল, প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে ওরা। এতটুকু আওয়াজ সাগর বুকে পৌঁছল না। হাওয়া বইছে পশ্চিম থেকে পুবে, ওদের উল্লাস ওদের কাছেই রয়ে গেল।

বালি খালাস হতে হতে পশ্চিম দিগন্তে পৌঁছলেন সূর্যদেব। শেষ বারের মত রাশি রাশি আবার ছড়িয়ে পড়ল সাগর জলে। সেই আবীরের ছোঁয়ায় আমরাও লালে লাল হয়ে গেলাম।

মহামান্য কাপ্তেন সাহেব তখন নোঙরের দড়ি আলগা করার আদেশ দান করলেন। চার জন করে জোয়ান এক এক গাছা দড়ি

ধরে দাঁড়াল, অল্প অল্প করে অতি সাবধানে দড়ি ছাড়া হতে লাগল। ঢেউয়ের ধাক্কায় একটু একটু করে সরতে লাগল নৌকা ডাঙার দিকে। সরতে সরতে হঠাৎ লাগল এক বিষম ঝাঁকুনি, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা হেলে পড়ল নৌকা। একদম সমাপ্তি, তার পর অবতরণ এবং পায়ের ওপর খাড়া হয়ে পাড়ি। যার যেখানে মর্জি চলে যাও, কেউ আটকে রাখবে না।

উঠে দাঁড়ালাম সবাই, নৌকার ধারে ঝুঁকে নিচে নজর ফেললাম। যা নজরে পড়ল, তা মাটি নয়। পাথর বালি মাটি দিয়ে গড়া ধরণী এবং নৌকার মাঝখানে অথই পানি। নৌকার চার পাশে পাক খেতে খেতে দরিয়া আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

নামো কে নামবে।

মুখ চুন করে সবাই সবায়ের বদন পানে তাকালাম।

যাদের নৌকা, তারা কয়েক জন এক এক গাছা দড়ির ডগা কোমরে বেঁধে ঝপাঝপ জলে পড়তে লাগল। কয়েকটা ঢেউয়ের ধাক্কায় পৌঁছে গেল তারা হাঁটু জলে। তার পর সেই দড়ি নিয়ে দৌড়ে গিয়ে চড়ল পাথরের ওপর। একটার পর একটা বাঁধন পড়ল ডাঙার সঙ্গে। তার পর দেখা গেল, একখানা চেপ্টা ডিঙিকে ডাঙা থেকে ঠেলে জলে নামানো হচ্ছে। নৌকার এক গাছা দড়ির সঙ্গে বাঁধা হল সেই ডিঙিখানাকে। তখন নৌকার লোকেরা টানতে লাগল সেই দড়ি। দড়িতে বাঁধা ডিঙি নৌকার গায়ে এসে লাগল। নজর করে দেখলাম, আর এক গাছা দড়ি বাঁধা আছে সেই ডিঙির লেজে, এবং সেই দড়িটার অপর প্রান্ত ডাঙায় মানুষদের হাতে রয়েছে।

অবতরণ পর্ব শুরু হল। নৌকার গায়ে বাঁধা একটা দড়ির মই বেয়ে ডিঙির ওপর নেমে পড়তে হবে। মাত্র আট দশ হাত নামা, তেমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। আদমজীর স্ত্রী আগে নামলেন, তার পর নামলেন ভৈরবী। নৌকার ওপর দু জন ডিঙির ওপর দু জন—পাকা লোক দাঁড়িয়ে সাবধানে ওঁদের নামিয়ে নিলেন। জম্‌শেদ্‌ সাহেবের দুখানা হাতে অসম্ভব জোর, নিঃশব্দে তিনি আমার হাত দুখানা ধরে চাপ দিতে লাগলেন। হাতে হাতে অনেক কথা হয়ে গেল। ওধারে পরমানন্দজী কৈকেয়ীনন্দন আদমজীর নামা শেষ, আমি নামলেই ডিঙি ছাড়বে।

তাড়া লাগালেন কাপ্তেন সাহেব। বললেন—তোমরা নিশ্চয়ই দু-তিন দিন মন্দিরে থাকবে। যাও নেমে, আমরা সবাই গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব। তোমাদের নিয়ে আসব আমাদের ঘরে। এখন নামো, তাড়াতাড়ি না করলে আঁধার হয়ে যাবে।

অতঃপর জম্‌শেদ্‌ সাহেবের মুঠো থেকে হাত দুখানা খসিয়ে নিয়ে ডিঙিতে নেমে পড়লাম। পাড়ের মানুষরা দড়ি টানতে লাগল। কচ্ছের কূলে তখন সাঁঝের ছোঁয়া লেগেছে। আমরা ধরণী-অঙ্গে পদার্পণ করলাম।

সঙ্গে সঙ্গে পাল্‌টে গেল হাওয়া। আমরা স্বাধীন, স্বাধীনতার প্রকাশটা পেল আমাদের ব্যবহারে, কেউ কারও তোয়াক্কা রাখলাম না। পরমানন্দজীকে নিয়ে যাবার জন্যে কয়েকজন লোক অপেক্ষা করছিল ঘোড়া নিয়ে। পাগড়ি তকমা গোঁফ তরবারি দেখে বুঝতে কষ্ট হল না, ওরা রাজার কর্মচারী। প্রচুর পরিমাণ খাতির সম্মান

পেলেন পরমানন্দজী, কাউকে ওঁর কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হল না। একটা কালো টাট্টুর পিঠে চড়ে বসলেন তিনি, অনুচররাও নিজের নিজের বাহনে আসীন হল। তার পর দে ছুট, নিমেষের মধ্যে পরমানন্দজী অন্তর্ধান করলেন।

শ্রীকৈকেয়ীনন্দন ভয়ানক শোরগোল তুলে তাঁর বিছানা বাক্স বয়ে নেবার জন্যে মানুষ ঠিক করতে লাগলেন। আদমজী এবং তাঁর স্ত্রীকে কারা যেন সঙ্গে নিয়ে গেল। বহুবার ওঁরা আসা যাওয়া করেছেন, ওঁদের চেনা-জানা মানুষের অভাব নেই। আমরা দুটি প্রাণী ফাঁপরে পড়ে গেলাম। আমাদের জন্যে কেউই আসে নি, কেউ আমাদের কিছু জিজ্ঞাসাও করে না। টিন বস্তা ঝোড়া ঝুড়ি বিস্তর সম্পত্তি ডাঁই হয়ে রয়েছে চারিদিকে, করাচীর ভক্তরা দরাজ হাতে পাথেয় দিয়েছিলেন। পথ ফুরিয়েছে পাথেয় ফুরায় নি। পাথেয়র পানে তাকিয়ে পাথরের মত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ওধারে নৌকা থেকে নৌকাওয়ালাদের মালপত্র নামাতে লাগল। দড়ি দানাটানি করে ডিঙিখানাকে নৌকার গায়ে নেওয়া হচ্ছে, মাল বোঝাই হলেই আবার ডাঙায় ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। কারও কোনও দিকে নজর দেবার ফুরসত নেই। অনেকদিন পরে সাগর থেকে ফিরে এসেছে আপন জনেরা, উল্লাসে উত্তেজনায় মেতে উঠেছে সকলে। কাকে কি জিজ্ঞাসা করি! তীর্থ করতে এসেছি আমরা, আশা করে এসেছি অন্য পাঁচটা তীর্থের মত এ তীর্থেও পাণ্ডা পুরুত থাকবে। তীর্থে পৌঁছে আমাদের আর কিছু খুঁজে বার করতে হবে না, তীর্থের মানুষরাই আমাদের খুঁজে বার করে ছেঁকে ধরবে। কোথায় কি, বাবা কোটেশ্বরের তরফ থেকে এক প্রাণীরও দেখা নেই। মন্দির

কত দূরে, সেখানে কেউ আছে কি না, আমরা সেখানে রাতের আশ্রয় পাব কি না, নানা জাতের প্রশ্ন মগজে তালগোল পাকাতে লাগল। মালপত্র পাহারা দেবার জন্যে ভৈরবীকে রেখে রওয়ানা হলাম আশ্রয় খুঁজতে। দেখাই যাক, মন্দির কতদূর।

'মাত্র কয়েক পা এগোতে হল, কয়েকটা পাথর টপকাতে হল, উঠলাম একটা ছোট্ট টিপির ওপর। মন্দির দেখতে পেলাম। ডান ধারে অল্প একটু তফাতে ভৈরব কোটেশ্বরের মন্দির—সাগর বেলায় স্তম্ভিত হয়ে বসে রয়েছে।

মন্দিরের অন্ধকার আকৃতি নজরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অমন হতচ্ছাড়া চেহারার মন্দির আর কি কোথাও নজরে পড়েছে!

একদা পাথর দিয়ে গেঁথে ভৈরবের মন্দির তৈরী করেছিল যারা, ভৈরবের চক্রান্তে তারা নিশ্চয়ই ধরাধাম ত্যাগ করেছে। দুঃখের কথা হল, তাদের হাতে গড়া মন্দিরটা ঠিক টিকে আছে! আছে বলেই নোনা জল নোনা হাওয়ার ঝাপটা খাচ্ছে। সর্বাঙ্গ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে মন্দিরের, কালো ঝামার স্তূপ মনে হল মন্দিরটাকে। একটা মর্মান্তিক বিষাদের ছবি। মন্দির দর্শনে ভয় ভক্তি পুলক উচ্ছ্বাস এর যে কোনও একটা ভাব উদয় হবে চিত্তে, তা না হয়ে মনটা করুণায় টনটন করে উঠল। আহা বেচারা, কেন মরতে দলছাড়া গোত্রছাড়া হয়ে একেবারে দেশটার পশ্চিম প্রান্তে সমুদ্রের কিনারায় বসতে গেলি বাবা!

থাক গে, যার যেমন বরাত। হোক ছাল ছাড়ানো অন্তিম দশা মন্দিরের, তবু ওর কাছেই যেতে হবে। গিয়ে খোঁজ নিতে হবে,

ওখানে রাত্রিবাস সম্ভব কিনা। মন্দির যখন রয়েছে, তখন দেবতা নিশ্চয়ই আছেন। দেবতা থাকলেই তাঁর সেবা পূজার জন্যে মানুষ থাকবে। মনে বেশ জোর পেলাম, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম মন্দির পানে। হঠাৎ বর্ধমান জেলার এক মহাপীঠের কথা মনে উদয় হল। তখন আমরা বাঙ্গলা দেশের মহাপীঠগুলো দর্শন করে বেড়াচ্ছিলাম। ক্ষীর-গ্রামে গিয়ে শুনলাম, আর এক মহাপীঠ অল্প দূরেই অবস্থান করছে। 'অজয় নদীর তীরে একটি গ্রামের ধারে ছিল এক প্রাচীন মন্দির'—চললাম দেখতে সেই মহাপীঠ। দর্শন হল, ভাঙা এক দালানে ভাঙা কাঠের সিংহাসনে পেতলের সিংহবাহিনী। সেই দালানের পেছন দিকে দালানের ছাদের কিনারায় খানকতক বাঁশ ফেলে এক খড়ের ছাপড়া তৈরী হয়েছে। তার অভ্যন্তরে সপরিবার পুরুত অবস্থান করছেন। মন্দিরে তিনি আসতে পারবেন না, কারণ জাতাশৌচ। ঠাকুর মহাশয়ের নবতম সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হয়েছে! ঠাকুর দালানের পেছন থেকে সেই সন্তান পরিত্রাহি চিৎকার করে স্বীয় অস্তিত্ব আমাদের জানিয়ে দিল। আমরা আর সেখানে দাঁড়াই নি, তৎক্ষণাৎ আবার পিছন ফিরে দৌড়। গ্রামটা ভুলে গেছি বলাই ভাল, কিন্তু সেই গ্রামে বাঙ্গলা দেশের এক অতি বিখ্যাত কবি বাস করেন এইটুকু এখনও ভুলতে পারি নি।

বহু তীর্থ বহু পীঠস্থান দেখতে দেখতে একটা খাঁটি সত্য হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। দেবতার স্থানে গেলে শুধু যে ভক্তিভাব উদয় হবে মনে, এমন কোনও কথা নেই। দেবতার দশা দেখে হৃদয়ে করুণার সঞ্চারও হতে পারে। একদল মানুষ জীবনের যা কিছু সঞ্চয় উজাড় করে মন্দির বানিয়ে দেবতা প্রতিষ্ঠা করে রেখে যায় আর এক দল মানুষ

সেই দেব-মহিমাকে অতি অবহেলায় দূরে সরিয়ে রাখে, কিংবা উপার্জনের একটা পন্থা দাঁড় করায়। ভুল, ভুল নয়—অমার্জনীয় অপরাধ করে যায় তারা যারা মন্দির বানায় দেবতা প্রতিষ্ঠা করে। ভবিষ্যৎ মানুষদের ওপর অতটা বেশী আস্থা রাখা মস্ত বড় অপরাধ। মন্দির যদি বানাতেই হয় তবে মনের মধ্যেই বানানো শ্রেয়। অবহেলা পাবার জন্যে দেবতাকে পাষাণ কারায় বন্ধ করা কিছুতেই উচিত নয়।

নানা কথা চিন্তা করতে করতে উপস্থিত হলাম মন্দিরের কাছে। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, ভয়ানক রকম চমকে উঠে দেখি, এক দল মানুষ প্রায় ঘিরে ধরেছে। কখন যে তারা পিছু নিয়েছে টের পাই নি। নানা আকারের প্রায় দেড় কুড়ি মানব সন্তান, প্রত্যেকের ললাট ভস্মলিপ্ত, কোমরে আধখানা কাপড় লুঙ্গির মত জড়ানো। প্রায় প্রত্যেকেরই আদুড় গা, নিঃশব্দে অনুসরণ করছে আমাকে। ফিরে দাঁড়িয়ে সভয়ে সকলের মুখপানে তাকালাম। না, হত্যা বা ঐ রকম হিংস্র কিছু একটা কারও মুখ চোখে ফুটে নেই। অকপট বোবা চাউনি, নতুন মানুষটাকে জানবার জন্যে এতটুকু ঔৎসুক্য পর্যন্ত নেই। আবছা অন্ধকারে ব্যথাতুর মন্দিরের সামনে আধো-আঁধার মূর্তিগুলিকে সজীব বলেই মনে হল না। ওঁরাও বোধ হয় সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের তমসাচ্ছন্ন গহ্বর থেকে সশরীরে হঠাৎ আবির্ভূত হলেন।

শুষ্ক কণ্ঠে যতটুকু কুলোল, ততটুকু জোর দিয়ে উচ্চারণ করলাম—জয় নারায়ণ। প্রত্যুত্তরে জয় নারায়ণ শুনতে পেলাম না। তবে রা ফুটল তাঁদের মুখে, বিচিত্র সুরে বিচিত্র ভাষায় সবাই এক সঙ্গে পরামর্শ জুড়ে দিলেন। পরামর্শটা ক্রমেই যেন হিংসার পথে অগ্রসর হল। হাতাহাতিটা আর হল না। ওঁদের ভেতর থেকে এক বৃদ্ধ আর এক

জোয়ান শেষ পর্যন্ত আলাদা হয়ে বেরিয়ে এলেন। এসে আমার ভার গ্রহণ করলেন। বুঝলাম ওঁদের ভাগেই পড়লাম আমরা—অর্থাৎ ওঁদের যজমান হয়ে গেলাম। তখন তাঁরা আমার সঙ্গে সাগর বেলায় ফিরে চললেন। মাল টানবার জন্যে কয়েকটি বাচ্চা ছেলে ঠিক করে ফেললেন তাঁরা, সেই নৌকাওয়ালাদেরই বাচ্চা সব। আভিজাত্যটুকু ঠিক বজায় রইল। মন্দিরের পূজারী বা পাণ্ডা হয়ে তাঁরা মোট বইতে যাবেন কেন। ঐ অকাজটা বিধর্মী মাঝির ঘরের ছেলেরাই করুক।

মাল পত্র নিয়ে যখন আবার পৌঁছলাম মন্দিরের সামনে তখন সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজছে। সেই সঙ্গে ঢ্যাপ ঢ্যাপ শব্দে সম্ভবতঃ একটা দামামা গোছের কিছু পেটানো হচ্ছে। সন্ধ্যারতি দেখ হল না, দেবতাকে প্রণাম করাও হল না, পাণ্ডাদের নির্দেশ অনুযায়ী অগ্রসর হতে হল। মন্দির ছাড়িয়ে প্রকাণ্ড একটা লবণ ক্ষেত। লবণের ওপর দিয়ে চলতে লাগলাম। সেটা যেখানে শেষ হল, সেখানে এক বাজার। দোকানে দোকানে তখন আলো জ্বলছে। বাজারের ভেতর দিয়ে গিয়ে গ্রামে ঢুকলাম। গ্রামের মাঝখানে এক ধর্মশালা। ঘর আছে, দালান আছে। দালানে থাকলে পয়সা কড়ি লাগবে না। ঘরে ঢুকলে দু-আনা করে দিতে হবে। দালান এবং ঘরের অবস্থা দেখে ভৈরবী আকাশের তলায় রাত কাটাবার বাসনা প্রকাশ করলেন। তৎক্ষণাৎ আর দু-আনা খরচা করে একটা ঘর সাফ করানো হল। বড় বড় মোমবাতি আট আনায় কিনে এনে দিলেন পাণ্ডার ছেলে, এক কলসী পানীয় জলের জন্যে আরও চার আনা দিতে হল। তার পর আমরা ঘরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলাম। ঝোড়া ঝুড়ি টিনে কৌটায় যা অবশিষ্ট আছে তা দিয়ে আরও কয়েকটা দিন নির্বিঘ্নে চলে যাবে।

অন্ততঃ রাতটা কাটুক, সকাল হোক, দেবতা দর্শন করে এসে তখন রান্না-বান্না পেটের চিন্তা করা যাবে।

মনে পড়ল মহাদেবী হিংলাজকে। স্বামী কোটেশ্বরকে এখানে ফেলে রেখে কেন যে দেবী সেই পাহাড়ের গর্তে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন, বুঝতে পারলাম। হোক পাহাড়, না থাকুক সেখানে পাণ্ডা পুরুত সেবা পূজার ব্যবস্থা। নোঙ্‌রা এবং নোঙ্‌রামিও নেই সেই মায়ের আশ্রমে। ছোট্ট একটি ঝরণা আর কয়েক ঝাড় রক্ত করবী নিয়ে মা সেখানে শান্তিতে আছেন। ভৈরবের আশ্রমে থাকলে দুর্গন্ধেই মারা যেতেন। কম যাতনায় কি আর মেয়েমানুষ স্বামীর সংসার ত্যাগ করে!

॥ বাবো ॥

আমরাও তিষ্ঠোতে পারলাম না। যাতনার চোটে প্রাণটাই বা যায় বুঝি। দেখতে দেখতে মুখখানা ফুলে ডুগির মত হয়ে উঠল। পেট ফুলে জয়ঢাক হবার রেওয়াজ আছে যখন, তখন মুখ ফুলে ডুগি হতে আপত্তি কোথায়। আপত্তি করলেই বা শুনছে কে। আপত্তি করেছিলাম বলেই লুকিয়ে গিয়ে পাকা ছাপটা নিয়ে এলেন ভৈরবী নাকের ওপর। ছোট একখানি ত্রিশুল পুড়িয়ে দেগে দিয়েছে, তার ওপর লাগিয়ে দিয়েছে কালো মত কি একটা মলম। একদম পাকা বন্দোবস্ত, নাক যতদিন থাকবে দাগটিও ততদিন রইল। যবনত্ব ঘোচাবার মোক্ষম দাওয়াই, দাওয়াইটা সেই বীরভূমের মোড়ল মশাই ব্যবহার করেছিলেন তাঁর এঁড়ের গায়ে। একটা মশাল জ্বালিয়ে

এঁড়েটার সর্বশরীরে চেপে ধরেছিলেন। মল পোকা এঁড়ের গায়ের, এঁড়েটিও গেল সেই সঙ্গে। তা যাক, পোকা তো গেল।

হিংলাজ দর্শন করলে যবনত্ব খানিকটা লেপটে যায় গায়। কোটেশ্বরের পাকা ছাপ নিলে সেটুকু ঘোচে। নগদ আড়াইটি টাকা দক্ষিণা দিয়ে পাকা ছাপ নিতে হয়। কাঁচা ছাপও আছে, মাত্র আনা দশেক দক্ষিণা তার। তবে সেটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়, পুড়িয়ে দেগে দেওয়া হয় না। তাই দু দিনেই উঠে যায়।

পরামর্শ করে ঠিক হয়েছিল যে যাবার দিন সকালে কাঁচা পাকা যা হোক একটা ছাপ নিলেই হবে। প্রথম দিনেই যে নিতে হবে এমন কোনও নিয়ম নেই। নিয়ম না থাকুক, আমাদের পাণ্ডা ঠাকুরের নগদ আড়াইটি টাকার খুবই প্রয়োজন ছিল সে দিন। তা ছাড়া ভৈরবীরও সন্দেহ ছিল যে অতবড় পাকা কাজটাকে শেষ পর্যন্ত কাঁচিয়ে দিতে পারি আমি। তাই তাড়াতাড়ি পাণ্ডার সঙ্গে ব্যবস্থাটা পাকা করে টুপ করে মন্দিরে গিয়ে ছাপটি নিয়ে এলেন। এসে গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে লাগলেন শুধু। তার পর এল জ্বর, জ্বরের চোটে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন যখন তখন আওয়াজটা বন্ধ হল। মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলাম।

প্রথমে হল রাগ। নাকের ওপর লোহা পোড়ার ছেঁকা দিয়ে যারা পয়সা রোজগার করে, তাদের ওপর প্রতিশোধটা কি ভাবে নেওয়া যায়—তার একটা উপায় ঠাওরাতে গিয়ে রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলতে লাগল। প্রতিশোধ নেবার মত একটা মতলব আঁটছি মনে মনে এটা জানতে পারলেও ওরা চরম শিক্ষা দিয়ে দিতে পারে। ওদিকে সুবিধে হবে না বুঝতে পেরে রাগটা ষোল দুগুণে বত্রিশ আনায় পৌঁছে পড়ল

গিয়ে ভৈরবীর ওপর। কেন মরতে গেল ঐ ছাপ নিতে! অমন অমানুষিক শখ যার সে মরবেই। কাঠ খেলে আঙরা ওগরাতেই হবে, কার সাধ্য বাঁচায়।

বাঁচবার উপায়ও নেই কিছু। ডাক্তার বদ্যি দাওয়াইখানা কিছুই নেই ত্রিসীমানায়। অগত্যা মনেব আগুন মনে নিয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম পোড়া অদৃষ্টের কথা। অপর্যাপ্ত আহার্য সামগ্রী সঙ্গে রযেছে, করাচী থেকে যা প্রণামী পাওয়া গেছে তাও সম্পূর্ণ অটুট অবস্থায় বিরাজ করছে কোমরে। অভাব বলতে কিছুই নেই। অন্ততঃ তিনটি রাত নিরুদ্‌বেগে কাটানো যাবে তীর্থস্থানে, এই আশায় পরম আরাম বোধ করছিলাম। প্রথম রাতটা কাটল। সকাল বেলা স্নানটান সেরে ভৈরব কোটেশ্বরকে দর্শন স্পর্শন করে এলাম। তার পর রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করতে হবে। বাজার থেকে কাঠকুটো কিনে আনবার জন্যে বেরতে যাচ্ছি, ভৈরবী বললেন—একটু বসুন টপ করে একবার ঘুরে আসি মন্দির থেকে। বলেই ছুটে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন একেবারে তৈরী হয়ে, শান্তি আরাম সমস্ত ঘুচল। তিনটি রাত যেখানে যাপন করবার বাসনা ছিল. সেখানে আর এক মুহূর্ত তিষ্ঠোতে ইচ্ছে করল না। কিন্তু পালানোই বা তখন যায় কেমন করে। বেহুঁশ জীবটাকে ফেলে রেখে পালানো সম্ভব নয়।

কেন নয়!

নিজেকে চোখ রাঙিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন সম্ভব নয় পালানো? কার সঙ্গে কি সম্বন্ধ আছে আমার? সন্ন্যাস যখন নিয়েছিলাম, তখন বিহরেৎ স্বেচ্ছয়া কথাটা শুনেছিলাম কি না।

ততো নির্দ্বন্দ্বরূপঃসৌ নিষ্কামঃ স্থিরমানসঃ।
বিহরেৎ স্বেচ্ছয়া শিষ্যঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়ো ভুবি ॥

সুখ দুঃখ দ্বন্দ্বরহিত, কামনা শূন্য, স্থিরচিত্ত এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হয়ে ভুবনে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াবে। এতগুলো সুযোগ সুবিধে পাব বলেই সন্ন্যাস নিয়েছিলাম। তা হলে চলে যাওয়াটা আটকাচ্ছে কোথায়। স্বেচ্ছয়া বিহরেৎ বাদ দিলে সন্ন্যাসীগিরির মজাটা থাকল কতটুকু।

কোথায় যেন শুনেছিলাম, রাজর্ষি জনক এক বাটি তেল হাতে দিয়ে শুকদেব গোস্বামীকে আদেশ করেছিলেন—যাও বাছা, এই তেলের বাটিটি হাতে নিয়ে আমার রাজপুরীটা মনের সুখে ঘুরে দেখে এসো। দেখবে, দুনিয়ার কত আজব বস্তুই না আমি জুটিয়েছি। দেখে খুব মজা পাবে।

মজা পেয়েছিলেন শুকদেব। সব দেখে শুনে ফিরে গিয়ে রাজর্ষির সামনে তেলের বাটিটা নামিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম—আর নয়। তামাম ভারত-বর্ষের যাবতায় তীর্থ এক রকম সারা হল। এখন গুরুদেবের সামনে উপস্থিত হয়ে তেলের বাটিটা নামিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে হবে। স্পষ্ট ভাষায় বলব—প্রভু, এবার রেহাই দিন। এই বেয়াড়া বোঝাটি আর কাঁধে চাপিয়ে দেবেন না। সন্ন্যাসী হয়েছি, স্বেচ্ছয়া বিহরেৎ করবার বাসনায়। সে সুখটুকুও যদি না থাকে, তা হলে বেঁচে থেকে লাভ কি!

হায় রে বেঁচে থাকা! বেঁচে থেকে লাভ কি, এই প্রশ্নের জবাবটি অপেক্ষা করছিল তখন দেবী আশাপূর্ণার জিম্মায়। দু দিন পরে

সেখানে পৌঁছে জানতে পারলাম বেঁচে থাকার লাভ কতটুকু। কিন্তু তার আগে শিখতে হল, বাঁচার মত বেঁচে থাকাটা কি ব্যাপার।

এধারে ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল। নড়ে চড়ে না, একটু টুঁ শব্দ পর্যন্ত নেই, স্রেফ মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। বেলা গড়িয়ে গেল। দু-একবার চেষ্টা করলাম ডেকে তুলে কিছু খাওয়াবার জন্যে। কে খাবে! মুখখানা এমন ফুলে উঠেছে যে দুই চোখ বুজে গেছে। মুখ দিয়ে শ্বাস টানছে, নাক আর নাকের কর্ম করছে না।

পাণ্ডা মহারাজদের দেখা নেই। ধর্মশালায় অন্য যাত্রী বলতে গোটা কতক রামছাগল আশ্রয় নিয়েছে। বেহুঁশ লোকটাকে একলা ফেলে রেখে বেরতে পারি না। গোটা সমুদ্রটা ডিঙিয়ে এসে ডাঙায় উঠে অকূল পাথারে পড়লাম। ওধারে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। এক বার বেরিয়ে বাজারে যেতে পারলে অন্ততঃ গোটা কতক ব্যথা কমাবার বড়ি কিনে আনতাম। ব্যথা কমাবার বড়ি দুনিয়ার সর্বত্র পাওয়া যায়। কিন্তু বড়িটাকে হাতের কাছে পাওয়া যায় না ব্যথার সময়, এইটুকুই দুনিয়ার বিশেষত্ব।

দুনিয়ার আর কি কি বিশেষত্ব আছে, তাই হিসেব করছি বসে বসে, এমন সময় বাইরে কলরব শোনা গেল। মনে হল, অনেক মানুষ খুবই উৎফুল্ল চিত্তে ধর্মশালায় ঢুকছে। এল বোধ হয় আর এক দল যাত্রী। যারাই আসুক, মানুষ যখন তখন আর ভাবনা নেই। উপায় একটা হবেই।

তেড়ে বেরলাম বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে গেলাম জমৃশেদ্ সাহেবের দুই বাহুর বন্ধনে। পালটে গেল দুনিয়ার রূপ, স্ত্রী পুরুষ

বহুজনে মিলে চতুর্দিকে ঘিরে হট্টগোল জুড়ে দিল। হঠাৎ খুবই নরম হয়ে পড়লাম, জল এসে গেল দুই চোখে। দুনিয়াখানা যার মর্জিতে চলছে, তার কথাটা খেয়াল হল তখন। মনে মনে বললাম—তোমার দুনিয়াদারি বোঝার হিম্মতটুকু দাও দয়াময়, মাঝে মাঝে কেন হুঁশ হারিয়ে যায়!

তার পর!

তার পর আর আমার কিছুই রইল না। স্বয়ং কাপ্তেন সাহেব এসেছেন। কাপ্তেন সাহেবের চেয়ে ঢের বড় তাঁর স্ত্রী এসেছেন। ওঁদের গ্রামসুদ্ধ সবাই প্রায় সমুপস্থিত হয়েছেন। সুতরাং তৎক্ষণাৎ লে আও খাটিয়া, উঠাও জলদি মাল, এবং ধর্মশালার কপালে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে চল এখনই আমাদের গাঁয়ে। আরে দূর দূর, তেপান্তরের মাঠে শয়তানের আড্ডায় কোন্ দুঃখে পড়ে থাকবে তোমরা? আমরা কি তোমাদের আপন জন নই?

বেহুঁশ ভৈরবীর জন্যে মনে বড় দুঃখ হল। যবনতত্ত্বটা খুবই জবর ভাবে ঘুচিয়েছিল বেচারী। যাদের কাঁধে চড়ে চলল, যাদের ঘরে চলল, তাদের পরিচয়টা এ সময় জানিয়ে দিতে পারলে কি করত!

কি যে করত ভাবতে গিয়ে কান্নার বদলে প্রাণ খুলে হেসে উঠলাম।

মালপত্র মোটঘাট নিয়ে সন্ধ্যার আগেই আবার লবণ ক্ষেত পার হলাম।

গাঁয়ের হকীম সামুদ্রিক দাওয়াই দিলেন। সমুদ্রে যা জন্মায় তাই দিয়ে তিনি চিকিৎসা করেন। সমুদ্রের ফেনা জলের সঙ্গে ঘষে মুখের

ওপর প্রলেপ দেওয়া হল। সমুদ্র ভাসিয়ে নিয়ে আসে বিশেষ এক জাতের কড়ি, সেই কড়ির পিঠটা ফাটালে জমাট তেলের মত একটা পদার্থ পাওয়া যায়, সেটা ছাগল দুধের সঙ্গে ফুটিয়ে একটু একটু মুখের মধ্যে দেওয়া হতে লাগল। আর শোঁকানো হতে লাগল যা তাও সমুদ্রে মেলে। শুনলাম, ঐ জিনিস এত দামী যে এক ভরির বদলে তিন ভরি সোনা পাওয়া যায। তা যাক—এক কপর্দকও নেওয়া হল না আমাদের কাছ থেকে। সন্ধ্যার পবেই ভৈরবী উঠে বসলেন, জ্বর কমে এসেছে। মুখের ফুলো ভোর পর্যন্ত একদম থাকবে না, তবে ফেনা ঘষা প্রলেপটা আরও দশ বারো অন্ততঃ দেওয়া চাই।

দশ বারো কেন, দু শ বার প্রলেপ দেওয়ার মানুষ ভৈরবীর পাশেই রয়েছে! গাঁ সুদ্ধ মেয়ে বউ গিন্নী-বান্নী সবাই বসে আছেন ভৈরবীকে ঘিরে। ওষুধপত্র খাওয়ানো প্রলেপ দেওয়া ইত্যাদি কাজগুলো নিঃশব্দে করে চলেছে একটি তরুণী। তরুণীর বযসটা পার হযে গেছে বোধ হয় তার, তবু তাকে তরুণীই বলতে হবে। অমন হালকা ছিমছাম শরীর আর একজনেরও নেই। পরেছেও সে অপূর্ব সাজ। গাঢ় সবুজ রঙেব পেল্লায় এক ঘাগরা, যার নীচে এক বিঘত চওড়া সোনালী জরির কাজ। খুব সরু কোমরে প্রায় আধ বিঘত চওড়া একখানা চকচকে সোনার পাত। ওটা হল কটিবন্ধ, নাভির ওপর কটিবন্ধের মুখে অনেকগুলি লাল নীল পাথর জ্বল জ্বল করে জ্বলছে! তার ওপর বিঘত খানেক দেখা যাচ্ছে বাদামী রঙের চামড়া, তার পর কাঁচুলি, কাঁচুলির রঙ গাঢ় লাল, এমনভাবে কাঁচুলিটি বসে আছে বুকে যে আবরণের আড়ালে বুক আরও নিরাবরণ হয়ে পড়েছে। এটা মানতেই হবে যে রহস্যময়ী কাঁচুলিটি না থাকলে বুকের রহস্যটা অমন

অসাধারণ ভাবে ফুটে উঠত না। পা থেকে কোমর, কোমর থেকে বুক পর্যন্তই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যায় সেই শরীরের, বুকের ওপর গলা মুখ নাক চোখ চুল কেমন তা আর নজরে পড়ে না। পড়বে কেমন করে, শরীরটার দিকে তাকালেই অদ্ভুত একটা চিন্তা মাথায় আসে।

মনে হয়, ওই শরীরটাও সামুদ্রিক পদার্থ। নীল সাগরের অতল তল থেকে ঐ তনু ভেসে উঠেছে। ওতে না আছে হাড় মাংস রক্ত, না আছে প্রাণ। আলাদা একটা কিছু, যা সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে থাকে, যা শুধু স্বপ্ন আর রহস্য দিয়ে গড়া, তাই ঘুরে বেড়াচ্ছে চোখের সামনে। দুখানি হাত, যে হাত দুখানিতে লুকিয়ে আছে সুর আর ছন্দ, সেই হাত দুখানি অনায়াসে করে চলেছে সব কাজ, সাগরের জল যেমন অনায়াসে ছোট ছোট ঢেউ তুলে অবিরাম এটা সেটা করে।

মনে মনে একটা নাম ঠিক করে ফেললাম সেই সাগর-কন্যার। কিন্তু পরিচয়টা না জানলে নামটা বলি কাকে!

ঠিক করে রাখলাম, দোস্ত জম্‌শেদ্‌কেই নামটা শুধোব। দোস্তর মেজাজটা যদি জুত মত থাকে, তা হলে আর একটা কথাও বলব। বলব—কেন মরছ সেই পুব দেশের কন্যের জন্যে? অমন কন্যে যদি পশ্চিম কূলেই পাওয়া যায়, তা হলে সেই পুরবিয়াকে ভুলে যাওয়াই ভাল।

কথা বলার ফুরসত পেলে তো বলব। দোস্ত একেবারে হৈ হৈ কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে। খুব মোটা গালিচা বিছিয়ে তার ওপর খুব বড় এক গুড়গুড়ি বসিয়েছে। গোলাপ ফুল জুটল না বলে শতবার ধিক্কার দিচ্ছে নিজের নসিবকে। গোলাপ না জুটুক গোলাপ জল গোলাপের আতর আছে। এত অপর্যাপ্ত আছে যে ছিটিয়ে দাও

চারদিকে। শুখনো মাছের গন্ধ যেন একটুও না পাওয়া যায়। তার পর জ্বালাও চিরাগ, মোম্বাসা থেকে আনা হয়েছে অতি সুগন্ধি ধূপশলাকা। সেগুলো গোছা গোছা জ্বালিয়ে দাও চারদিকে। রাত বাড়ুক, অনেক রাতে শুরু হবে মুসায়েরা। ততক্ষণে আকাশে চাঁদের ছোঁয়া লাগবে।

কি ব্যাপার। সমুদ্রের ধারে লক্ষ্মীছাড়া এক গ্রাম। গ্রাম অর্থে এখানে ওখানে ছেটানো ছড়ানো কয়েকখানা টিনের চালা। তার মধ্যে এত প্রাণ, এত মাধুর্য, সুন্দরের জন্যে এই পরিমাণ আকুলি-বিকুলি, এ সমস্ত জন্মায় কেমন করে।

বিরহ থেকে। বিরহের চেয়ে বড় কি আর কিছু আছে। নদীয়ার নিমাইচাঁদ ঐ সত্যটুকুই বোঝাতে চেয়েছিলেন মানুষকে। বলেছিলেন, ভক্তির চেয়ে বড় প্রেম আর প্রেমের চেয়ে বড় বিরহ। পাওয়ার চেয়ে ঢের দামী ব্যাপার হল না পাওয়া। পেলে পরে তো পাওয়া হয়ে গেল, পাওয়া গেলে দেখতে দেখতে টানটা কমে আসে। আর না পেলে টানটা বাড়ে। দুঃসহ বিরহ জ্বালায় অষ্টপ্রহর জ্বলার নামই হল শ্রীরাধিকার ভাব। এই বিরহ ভাবে বিভোর থাকলে নিশিদিন অনুক্ষণ তার কথাটি ভোলা যায় না। তখন প্রেমটা পুড়তে পুড়তে খাঁটি সোনা হয়। মহাকবি চণ্ডীদাস বলেই গেছেন সেই নিকষিত হেমের কথা। আহা, বিরহের চেয়ে নিকষিত হেম হওয়ার বড় দাওয়াই কি আর কিছু আছে!

দোস্তর আমার তাই হয়েছে। নৌকার লেজে হাল ধরে বসে অনুক্ষণ সেই দিলের আগুনে পোড়া! দোস্ত আমার পুড়তে পুড়তে নিকষিত হেম হয়ে গেছে। ফলে ঐ কবিতার প্রতি আসক্তি, কায়া

যেখানে মেলে না সেখানে কায়ার বদলে কথা দিয়ে গড়া ছায়া নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

অথচ সামনেই রয়েছে ঐ সাগরকন্যা। ওটি যদি অন্য কারও সম্পত্তি হয়, তা হলে দোস্ত ঐ রকম আর একটিকে অনায়াসে খুঁজে বার করতে পারে। একটি যখন রয়েছে তখন আরও দুটি একটি কি খুঁজে পাওয়া যাবে না। আলবত যায়, কিন্তু খুঁজছে কে! বিরহের তাপে দোস্তর দশাটা হয়েছে সেই রকম—একমাত্র সেই শ্যামরূপ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না।

দোস্তের দশা নিয়ে আরও খানিক মশগুল হয়ে থাকার বাসনা ছিল। বাসনাটাকে মুলতুবী রেখে উঠতে হল। খাওয়ার ডাক এসে গেছে।

বড় বড় মাদুর বিছিয়ে খোলা আকাশের তলায় খাওয়ার আসর পড়েছে। মাঝখানে বসেছে আধ মন মাল ধরে এমন মাপের এক কাঠের গামলা। তার মধ্যে ভরতি রয়েছে চাপ চাপ মটর। মটরের মধ্যে উঁকি মারছে ইয়া ইয়া মাংসের ডেলা। কাপ্তেন সাহেব বুঝিয়ে দিলেন, মাংসটা নিষিদ্ধ মাংস নয়। দুম্বা নামে এক জীব আছে, ভেড়ার দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি হয় তারা। সেই দুম্বা একটি দেহদান করেছে আমাদের ভোজের জন্যে।

দেহদান কে করেছে তা জানার গরজ নেই তখন। নিজের দেহটার মধ্যে জ্বলে উঠেছে অগ্নি। একখানি রঙচঙে সানকী নিয়ে শুরু করে দিলাম। দুম্বার মাংসের সঙ্গে মটর এবং তন্দুরী রুটি। নিয়ম রুটি মাংস মটর নিজের মর্জি মত উঠিয়ে নিতে হবে। যতবার খুশি নাও, নেবার জন্যে সেই কাঠের গামলায় একখানা কাঠের হাতা চোবানো আছে।

খাওয়া চলল।

কাপ্তেন সাহেব বসেছেন ঠিক পাশে। কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—দরিয়াতে বিস্তর কেচ্ছা শুনিয়েছে আপনাকে আমাদের কবি। হরদম্ দেখতাম ওর সামনে বসে থাকতেন। কি শোনাল? কোন্ মুল্লুকের হুরীর কেচ্ছা শুনলেন?

কেমন যেন খটকা লেগে গেল। বললাম সেই পুব দেশের কন্যার কথা। খুবই দুঃখ প্রকাশ করলাম। আহা, অমন প্রেম! মিলনটা আর হল না।

মস্ত বড় একখানা বারকোশ বোঝাই আস্ত আস্ত মাছ ভাজা নিয়ে আসরে নামলেন সেই সামুদ্রিক কন্যা। সর্বাগ্রে আমার সানকীতে দিতে এলেন। কাপ্তেন সাহেব অত্যন্ত ভালমানুষের মত বললেন তাকে—এবার কবি এক পুব দেশের কন্যের কাহিনী শুনিয়ে এ বেচারাকে মস্ত্ করে ছেড়েছিল রওশন্, কেচ্ছাটাকে তুই এই ভদ্র-লোকের কাছে জেনে নিস।

অপরূপ ভঙ্গিমায় গ্রীবাটি ঘুরিয়ে চোখে মুখে বিচিত্র আলো ফুটিয়ে রওশন্ বললে—তাই নাকি! তা তো বলবেই। পুব দেশ থেকে আপনারা এসেছেন কি না।

মেয়েটি চলে যাবার পরে চুপি চুপি কাপ্তেন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম—ও কে? আপনার নাতনী বুঝি?

কাপ্তেন একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললেন—না, খোদায় আমাকে ছেলে-মেয়ে দেয় নি। তাই এই গাঁ সুদ্ধ সবাই আমার ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী। আর ঐ যাকে দেখলেন, ওটি হল আমাদের কবির ঘরনী, আপনার দোস্তর পরিবার। ওর কাছ ছাড়া হলেই আপনার দোস্তর মাথা সাফ হয়ে যায়। ভাল ভাল কেচ্ছা বানিয়ে বানিয়ে

বলতে পারে। সবই আশনাই, সবই ওর নিজের আশনাই। আর প্রত্যেক বার নতুন একজনের সঙ্গে আশনাই। আশনাই করতে করতে তামাম তুনিয়ার সব জাতের মেয়ে শেষ করে ফেলেছে। বাকী ছিল পুব দেশটা, আপনাকে পেয়ে পুব দেশের কন্যের দফাও রফা করে ছাড়লে। এখন বলুন না সেই রকম একটা গল্প শোনাতে। পারবে না, কিছুতেই পারবে না। রওশন যে এখন সামনে রয়েছে।

মাছ ভাজায় কামড় দিলাম। কবি-প্রেয়সী স্বহস্তে ভেজে এনেছেন। অপূর্ব আস্বাদ।

খাওয়া-দাওয়ার পরে গুড়গুড়িতে আগুন চড়ল। গালিচার ওপর আসীন হলাম সবাই। এল শারিঙ্গী, এল একটা পুঁচকে হারমোনিয়াম। প্রকাণ্ড পাগড়ি জড়ানো পাকা দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক শারিঙ্গীতে সুর চড়াতে শুরু করলেন। তার পর আবির্ভূত হলেন স্বয়ং জমশেদ্ সাহেব। চেনবার উপায় নেই। জরিদার শুঁড় তোলা নাগরা, চুড়িদার চুস্ত পাজামা, বিচিত্র কারুকার্য করা কামিজ, তার ওপর বগলকাটা মখমলের কোট আর মাথায় রুপালী তাজ। হায় হায়! সত্যিকারের বাদশাজাদারা কে কেমন দেখতে ছিলেন জানি না। কিন্তু আমার দোস্তের সে রূপ দেখলে যে কোনও বাদশাজাদী যে মূর্চ্ছা যেতেন এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। কল্পনা করবার চেষ্টা করলাম, কবি-প্রেয়সী যদি এখন একবারটি কবির পাশে দাঁড়াতেন, তা হলে ব্যাপারটা কেমন হত! কিন্তু তা হবার উপায় নেই। মেয়েরা ওধারে খেতে বসেছেন। মেয়েদের খাওয়াটা শেষ হলেই শুরু হবে মুসায়েরা। ততক্ষণ গুড়গুড়ি চলুক।

সমুদ্র থেকে মিঠে হাওয়া এসে গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়ার কেমন যেন একটা নেশার আমেজ এসে গেছে। তার সঙ্গে মিশেছে গোলাপের গন্ধ। আর আছে তামাকের ধোঁয়া। অত রকমের সুগন্ধের মধ্যে ঐ উৎকট গন্ধ না থাকলে যেন মানাতই না।

হঠাৎ কে একজন ছুটে এসে কাপ্তেন সাহেবের কানের কাছে কি বলে গেল। লোকটি যেমন ভাবে এসেছিল দৌড়ে, তেমনি ভাবেই দৌড়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কাপ্তেন সাহেব উঠে পড়লেন। অবোধ্য ভাষায় কি বললেন সকলকে। আরও জন পাঁচ ছয় উঠে পড়ল। কাপ্তেন সাহেব আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে গেলেন। খুব জরুরী প্রয়োজন তাই একবার যেতে হচ্ছে। ফিরতে দেরি হবে না। মুসায়েরা শুরু হক।

শারিঙ্গীতে ছড়ের টান পড়ল। সিকিখানা চাঁদ তখন অনেক দূরে উঁকি মারছে।

॥ তেরো ॥

আরব সাগরের কূলে বসে কবিতা শুনেছিলাম সেই রাত্রে। তার পর বহু রাত পার হয়ে গেছে। এখন আবার যদি সেই কবিতা শোনার মোওকা জোটে কপালে, তা হলে সইতে পারব না। সেই কবিতা শোনার মত জোর আর নেই বুকে, সেই কবিতার দু-চারটে দমকও সইতে পারব না এখন। টুপ করে বুকের ধুকপুকুনিটুকু থেমে যাবে।

শখ হয়, ভারতের পুব কূলের কবিদের ধরে নিয়ে গিয়ে একবার

সেই পশ্চিম কূলের কবির কবিতা পাঠ শোনাতে। পিলে জিনিসটা কবিদের পেটে আছে কিনা ঠিক জানি না, কারণ এপর্যন্ত একমাত্র হৃদয় ছাড়া অন্য কোনও পদার্থ নিয়ে কবিদের কারবার করতে দেখি নি। হলফ করে বলতে পারি, পিলেরা যদি থাকে কবিদের পেটে তা হলে সেই কবিতা শুনতে বসে এমন ভাবেই তারা চমকাবে যে জীবনে আর কাব্যরস পান করতে হবে না। মলয় সমীর জোছনার পরশ চামেলীর হা হুতাশ, এই সব পেলব কাণ্ডকারখানাগুলো দেখলেই কবিরা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে থাকবেন, ব্যথা বিরহ বিম্বাধরা কোনও কিছু তাঁদের আটকাতে পারবে না।

কোথায় যেন শুনেছিলাম—বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। কবিতার রস উপলব্ধি করতে হলে বাক্য বোঝা চাই। একদম বাজে কথা, স্বয়ং কবি যদি তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন তা হলে তাঁর হাব ভাব গলার স্বরে কাব্যরস ষোল আনা প্রকাশ হতে বাধ্য। আমার বন্ধু জমৃশেদ্ সাহেব সে দিন রাত্রে বাঁ হাতের চেটো দিয়ে বাঁ কান চেপে ধরে ডান হাতখানা থাপ্পড় মারবার ভঙ্গিমায় মুহুর্মুহু নাড়তে নাড়তে চোখ বুজে গলার শিরগুলোকে ফুলিয়ে তেড়ে তেড়ে হুংকার ছেড়ে যে কাব্যরস পরিবেশন করলেন, তার বাক্য একটিও না বুঝলেও অর্থটি হৃদয়ঙ্গম করতে এতটুকু কষ্ট হল না। তবে সে কাব্যের মর্মোদ্ভেদ করবার আগেই বুকের পাঁজরগুলো ঝাঁজরা হয়ে গেল। সে কাব্যের প্রতিটি বাক্যই বুলেট, কবির মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে সোজা শ্রোতার পাঁজরার মধ্যে প্রবেশ করে।

সেই মারাত্মক কাব্য-তাণ্ডব কতক্ষণ চলেছিল বলতে পারব না। স্থান কাল পাত্র সম্বন্ধে বিলকুল বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম। ফ্যাল

ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলাম শুধু কবির মুখ পানে। ভাবছিলাম, গেল বুঝি এবাব গলার শিরগুলো ছিঁড়ে। কিম্বা আস্ত হৃৎপিণ্ডটাই বুঝি কবিতার সঙ্গে মুখ দিযে বেরিয়ে আসে। সেই তুলকালাম কাণ্ডের মধ্যে কে আবার কবির হাতে তুলে দিলে এক বাদ্যযন্ত্র। প্রকাণ্ড একখানা বগী থালার মত জিনিসটা, তলাটা চামড়া দিয়ে বাঁধানো। আর আর থালার কানায় কয়েক জোড়া করতাল গাঁথা আছে। সেখানা হাতে পেয়ে বাঁ কানটা ছেড়ে দিলেন কবি, ছেড়ে বাঁ হাতে সেটা ধরে মাথার ওপর তুলে নাচতে লাগলেন। মাঝে মাঝে ডান হাতে সেই চামড়ার ওপর পড়তে লাগল চাপড়। যেটুকু বাকী ছিল সেটুকু পূরণ হল। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে হাত দুখানা উঠে গেল দুই কানে। দু হাতে দু কান চেপে ধরে শুধু চক্ষু দুটির সাহায্যে সেই ভয়ঙ্করী কাব্যসুধা পান করতে লাগলাম।

রাত প্রায় খতম হয়ে এসেছে তখন, খানিকক্ষণ একটানা আ আঁ আওয়াজ করে কবি ক্ষান্ত হলেন। তার পর আর এক কবির ওঠবার পালা। কিন্তু কি যেন একটা গণ্ডগোল হতে লাগল মেয়েদের দিকে। কাপ্তেন সাহেবের স্ত্রী চাপা গলায় খানিকক্ষণ বক্তৃতা দিলেন। পুরুষরা সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠল। জমৃশেদ্ তার সাজপোশাক খুলতে শুরু করলে। খানিকটা আন্দাজ করতে পারলাম, কবিতা শুরু হবার আগে কাপ্তেন সাহেব কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে সেই যে গেলেন আর ফিরলেন না তো! এতক্ষণ ধরে কোথায় গিয়ে কি করছেন তাঁরা!

আন্দাজটা ঠিকই করেছিলাম। দেখতে দেখতে তৈরী হয়ে গেল সবাই, অনেকগুলো সড়কি বল্লম এসে জমা হল আসরের মাঝখানে। যে যার জামা পাজামা খুলে ফেলে শুধু জাঙিয়া পরে অস্ত্র বেছে নিলে।

জম্‌শেদ্‌কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমিও সঙ্গে যেতে পারি কিনা। আবার পরামর্শ হল ওদের মধ্যে। জম্‌শেদ্‌ বললে—না, কাপ্তেন সাহেবের হুকুম ছাড়া তোমার যাওয়া চলবে না।

তার মানে? আমরা কি এখানে বন্দী হয়ে আছি নাকি!

না। খুশী হয় চল. কিন্তু না গেলেই ভাল হত। গোলমালটা যখন তোমাদের নিয়েই বেধেছে, তখন—

গোলমাল বেধেছে আমাদের নিয়ে! কি গোলমাল? কাদের সঙ্গে গোলমাল?

বয়োজ্যেষ্ঠ এক জন তখন ভাল করে আমায় বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা। আমরা দু জন ধর্মশালা ছেড়ে চলে এসেছি বলে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। মন্দিরের পাণ্ডা পুরুতরা ক্ষেপে উঠেছে। কাপ্তেন সাহেবকে ডেকে নিয়ে গিয়েছে তারাই। ফয়সলা নিশ্চয়ই হয়.নি, হলে কাপ্তেন সাহেব ফিরে আসতেন এতক্ষণ।

লাফিয়ে উঠলাম। ফয়সলাটা আমাকেই করে আসতে হবে। যেখানে আমাদের মর্জি হবে, সেখানে যাব। মন্দিরের পাণ্ডা পুরুতরা তা নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন? আমরা কি তাদের কেনা গোলাম নাকি?

কেনা গোলামের চেয়ে আরও কিছু বেশী। আমরা হিন্দু, হিন্দু হয়ে তীর্থ করতে এসে মুসলমানদের আশ্রয়ে চলে এসেছি, এতে হিন্দু জাতের মাথা কাটা গেছে। সুতরাং দাবি উঠেছে, আমাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। আমাদের একবার হাতে পেলে তাঁরা মোক্ষম ভাবে শোধন করে ছাড়বেন, এই জন্যেই কাপ্তেন সাহেব আমাদের আটকে রাখবার হুকুম দিয়ে গেছেন। অন্য কিছুর জন্যে না হোক, কাপ্তেন

সাহেবের মানটা রক্ষা করার জন্যেও আমার না যাওয়া উচিত। ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হোক আগে, তার পর আমরা যেখানে খুশী চলে যাব, কেউ বাধা দেবে না।

বাধা দেবার জন্যে পুরুষ বলতে এক প্রাণীও রইল না। সড়কি বল্লম হাতে নিয়ে নিঃশব্দে রওনা হল সবাই। মেয়েরাও চলে গেল আসর ছেড়ে, একলা আসরের এক পাশে পড়ে রইলাম। অত্যুজ্জ্বল কয়েকটা আলো শুধু তাকিয়ে রইল আমাদের পানে, নিদারুণ লজ্জায় মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়ে একটা উপায় ঠাওরাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। মানুষ জাতের মধ্যে থাকবার এতটুকু প্রবৃত্তি রইল না আর মানুষ ছাড়া আর যে কোনও জীব, সাপ বাঘ ভেড়া গরু যা হোক, মানুষের মত যারা মনগড়া জাত নিয়ে কামড়া-কামড়ি করে না, এমন কিছু একটা হতে পারলে স্বস্তির নিঃশেষ ফেলে বাঁচা যেত। সাপ-বাঘেরা পেটের জ্বালায় এ ওকে সে তাকে খাচ্ছে, সেটা কোনও অন্যায় কর্ম নয়। দিব্যি সুখে শান্তিতে মানুষ জাতটা দুনিয়ার বুকে টিকে থাকতে পারে, এমন পরিমাণে হাওয়া আলো জল রয়েছে ধরিত্রীর বুকে। ক্ষুধার অন্ন স্বয়ং ধরিত্রী মানুষ জাতটার জন্যে যুগিয়ে চলেছেন। তবু এরা খেয়োখেয়ি করবেই। অন্য কোন্ জীব মানুষ-জীবদের মত অহেতুক হানাহানি করে!

মজার কথা হচ্ছে, আমার কোনও জাত নেই। এমন কি, মনুষ্য জাতের মধ্যে আমি পড়ি কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। পরিচয় যার নেই, তার জাত কি! জাতের কথা বলতে গেলে একমাত্র সদুত্তর, ভিখিরীর জাত বা জাত-ভিখিরী। জাত-ভিখিরীকে নিয়ে খেয়োখেয়ি

লেগে গেল। অপরাধ আমার নয়, অপরাধ ভগবানের। কারণ ভগবানের জাত আছে, ভগবানের পরিচয় আছে। কোটেশ্বর ঈশ্বর হলে হবে কি, জাতের বড়াইটা ছাড়তে পারেন নি।

তাই ঈশ্বরের চেলারা খেপে উঠেছেন। ঈশ্বরের মান সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্যে একটা খুনোখুনি করবার মতলব এঁটেছেন। বেচারা ঈশ্বর ঐ জরাজীর্ণ মন্দিরের মধ্যে বসে মাথা কপাল চাপড়াচ্ছেন হয়তো, উঠে হেঁটে মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে এসে চেলাদের বাধা দেবেন সে উপায় নেই। ঈশ্বরকে পাকাপোক্ত ভাবে পাথরের মধ্যে পুরে পাথরের সঙ্গে গেড়ে ফেলা হয়েছে যে, নড়বেন কেমন করে!

ঈশ্বর না নড়তে পারুন, আমি পারি। ঈশ্বরের হাত পা নেই, আমার আছে। এ ভাবে চুপচাপ শুয়ে থাকা সম্ভব নয়। কি করবে ঈশ্বরের চেলারা। কি করতে পারে আমার! মোক্ষম ভাবে শোষণ করে ছাড়বে! দেখাই যাক। এক জনের নাকের ওপর লোহা পুড়িয়ে ছেঁকা দিয়েছে আড়াইটি টাকা উপার্জনের জন্যে। তার প্রতিশোধটাও নেওয়া হয় নি। সুদে আসলে সমস্ত উসুল করতে হবে। ঈশ্বরদের স্পর্ধা মানুষের চেয়ে শত গুণ বেড়ে গেছে। হেস্তনেস্ত একটা করাই চাই।

উঠে পড়লাম। জনপ্রাণী নেই ধারে কাছে, নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মন্দিরটা কোন্ দিকে, আন্দাজ করতে পারলাম না। মন্দিরের কাছে পৌঁছতে পারলে পাণ্ডাদের গ্রাম ঠিক চিনে নোব। সমুদ্রের দিকে পিঠ করে সোজা এগোতে লাগলাম। পাথর বালি কাঁকরের টিলা টালা টপকে সজোরে চলেছি। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, পায়ের নীচে কি পড়ছে না পড়ছে বিবেচনা করার দরকার নেই।

বহুকাল শুধু পায়ে চলার দরুন পায়ের তলায় সাড়াও নেই। সাধারণ কাঁটা খোঁচা পায়ের তলায় বিঁধলেও বুঝতে পারি না।

জ্যান্ত কিছু পড়লে অবশ্য বুঝতে পারা যায়। জ্যান্ত জীবের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়লে সে বেচারা সাড়া দেবেই। ব্যা করে উঠল জীবটা, পর মুহূর্তেই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। তুলকালাম কাণ্ড লেগে গেল আচম্বিতে। ব্যা ব্যা শব্দে শত শত ভেড়া চেঁচাতে লাগল। হুড়োহুড়ি গুঁতোগুঁতির চোটে পায়ের ওপর খাড়া থাকতে পারলাম না। যত বার সোজা হয়ে দাঁড়াতে যাই, ধাক্কার চোটে আবার তাদেরই ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ি। বিকট চিৎকার করে উঠল কতকগুলো কুকুর। তার পর মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। ডান দিক থেকে তিনটে মশাল এগিয়ে আসছে, দেখলাম। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম—এধারে, এধারে চলে এসো। ভেড়াদের ভেতর থেকে বেরতে পারছি না।

মশালওয়ালারাও সাড়া দিল, কি বললে বুঝতে পারলাম না। খুব সম্ভব কুকুরগুলোকে চুপ করতে বলল। ভেড়াগুলোও দাঁড়াল স্থির হয়ে, তাদের মাঝখানে আমিও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কাছাকাছি এসে একজন জিজ্ঞাসা করলে—কে তুমি ?

আর এক জন বললে—ক জন আছ তোমরা ?

বুড়ো মানুষের গলা শোনা গেল তার পর—হুঁশিয়ার, আর এগিয়ে কাজ নেই। ওদের হাতে কিছু থাকতে পারে।

চিৎকার করে বললাম—আমার হাতে কিচ্ছু নেই, আমি একলা। সঙ্গে কেউ নেই আমার। ভিন্ দেশী মানুষ আমি, কোটেশ্বরজী দর্শন করতে এসেছি তোমাদের দেশে। রাতে পথ হারিয়ে ফেলে ভেড়াদের মধ্যে পড়ে গেছি।

গলা খাটো করে ওরা খানিক পরামর্শ করে নিল। তার পর বুড়োটা বলল—এসো, এগিয়ে এসো আমাদের কাছে, দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

বললাম—যাব কেমন করে? ভেড়ারা ঘিরে ধরেছে, সামনে পেছনে কোনও দিকে পা বাড়াবার উপায় নেই।

হো হো শব্দে তারা হেসে উঠল। তার পর সেই ভেড়ার সমুদ্রের ভেতর দিয়ে মশাল তিনটে এগিয়ে আসতে লাগল। চু চু তো তো হা হা না না জাতের আওয়াজ করে ভেড়াদের নড়াচড়া করতে মানা করলে বোধ হয়। ভেড়ারা ভেড়া হলে হবে কি, তাদের ভাষা বুঝে ফেললে নির্বিঘ্নে তারা পৌঁছে গেল আমার সামনে। মশালের আলোয় বেশ করে দেখে নিলে আমায়। তার পর বুড়ো লোকটি দু হাত জোড় করে বললে—জয় নারাণ।

ওরা হল কচ্ছের আসল অধিবাসী। কচ্ছের আসল অধিবাসীরা ঘোড়া গরু ভেড়া ছাগল চরিয়ে বেড়ায়। বউ ছেলেপিলে সঙ্গে নিয়ে বারো মাস ওরা ঘুরছে। যেখানে পশুর খোরাক জুটবে, সেখানে চলল। সমস্ত কচ্ছ প্রদেশটাই পশু চরাবার মাঠ। চাষ আবাদ যা হয়, তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। পশুই হল সম্পদ, গরু ছাগল ভেড়ার দৌলতে ওদের বিস্তর লোক লাখপতি হয়ে গেছে। লাখপতি হবার পরে অবশ্য চরাতে বেরয় না কেউ। শহরে গিয়ে ঘরবাড়ি বানিয়ে সম্ভ্রান্ত মানুষ হয়ে যায়। তখন পশু চরাবার জন্যে মানুষ রাখে। আমাদের এধারে যেমন ভাগে জমি চাষ করায়, কচ্ছ প্রদেশে তেমনি ভাগে পশু পালন করা চলে।

দুই ছেলে নিয়ে নাথুরামজী একপাল ভেড়া চরিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ভেড়ার চাষ করছেন তিনি মাত্র বছর তিনেক, আগে গরু মোষের কারবার করতেন। গরু মোষের চেয়ে ভেড়াতে লাভ, ঝুঁকি কম। একটা মোষ গরু মলে যা লোকসান হয়, দশটা ভেড়া মলেও তা হয় না। ভেড়ার লোম কেটে বেচে দিলে আবার লোম গজায়। ভেড়ার বংশ বাড়েও খুব তাড়াতাড়ি, কিন্তু ভেড়া চরানোটা ছেলেরা বরদাস্ত করতে চায় না। ভেড়ার ইজ্জৎ নেই। ভেড়াগুলোকে বেচে দিয়ে গোটাকতক ঘোড়া কিনে ফেলবার বাসনা আছে।

খাটিয়ার ওপর বসে বুড়োর সংসারে কথা শুনতে লাগলাম। আমার নিজের কথা বলার সুযোগই পেলাম না। ওধারে আকাশের কোলে সিঁদুরে আভা ফুটে উঠেছে আস্তে আস্তে, আর একটা দিন আরম্ভ হতে চলেছে। জম্‌শেদ্ সাহেবরা সড়কি বল্লম নিয়ে গিয়ে কি কাণ্ড করে বসল, তাই বা কে জানে!

বুড়োর কথার মাঝখানে উঠে পড়তে পারি না, আমাকে এক সাধু ঠাওরে দস্তুর মত খাতির যত্ন শুরু করে দিয়েছে। এ সময় কি করে বলা যায় যে একটা ছ্যাঁচড়া ব্যাপারের মধ্যে পড়ে গিয়েছি আমি। সাধুর কাছে মনের কথা বলে মানুষে মন হালকা করার জন্যে। সাধুদের মনে কোনও অশান্তি নেই। সাধুরা লোককে শান্তি দিতে পারেন। তাই সাধু একজন পেয়ে গেলে সংসারী মানুষেরা কিছুক্ষণের জন্যে বর্তে যায়।

নাথুরামজী আর তাঁর জোয়ান ছেলেরাও বর্তে গেছে। সাধুকে খাটিয়ার ওপর বসিয়ে কলকেয় তামাক সাজছে। সবেমাত্র সুখ-দুঃখের কথা শুরু হচ্ছে। এমন সময় উঠে পড়লে এদের মনের অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে!

যেমনই দাঁড়াক, আর দেরি করা যায় না। মন্দিরটা কোন্ দিকে জিজ্ঞাসা করলাম। মন্দিরের নাম শুনেই নাথুরাম চটে গেলেন। বললেন—ওই ওধারে, মন্দিরে ধারে কাছে আমরা যাই না। মন্দিরের কাছে সব ডাকুরা বাস করে। ওধারে গেলেই দু দশটা ভেড়া খোয়া যাবে। ডাকুরা জোর করে কেড়ে নেবে।

জোর করে কেড়ে নেবে তোমাদের ভেড়া! তাজ্জব বনে গেলাম।

নাথুরাম বললেন—সবই ওদের সেবায় লাগে। শিউজী ভগবান কি ভেড়া খায় কখনও? ও সব হল ঐ ডাকুদের চালাকি। ভগবানের নাম করে ওরা মানুষকে ঠকায়। যার কাছ থেকে যা পেলে ছিনিয়ে নিলে। ব্রাহ্মণ কি না সবাই, অন্য কোন কাজ-কারবার যে করতে পারে না।

বললাম—তোমাদের এখানে আইন নেই? তোমাদের এক রাজা আছেন শুনেছি, তিনি ওদের শায়েস্তা করেন না?

নাথুরাম তখন ওদের দেশের রাজার আচার-ব্যবহার শাসন-ব্যবস্থা বোঝাতে লাগল। রাজা আছেন, তাঁর শাসনও আছে। রাজকর্মচারীরা সেই শাসনের জোরে খাজনা আদায় করে। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাধু সন্তদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা হয় না, তাই ওরা রাজার আইনের আওতায় পড়ে না। রাজাও যেমন খাজনা আদায় করেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাধু সন্তরাও তেমনি খাজনা আদায় করে। বড় বড় মঠ আছে দেশে, মঠওয়ালাদের ক্ষমতা রাজার চেয়ে অনেক বেশী। মঠওয়ালাদের চটালে রাজার রাজত্ব থাকবে না।

তা হলে উপায় কি? তোমাদের অত্যাচার হলে তোমরা যাও

কার কাছে ? এইভাবে কি মানুষ বাঁচতে পারে ? কথা কটা মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ল।

নাথুরাম বললে—বাঁচি আমরা আশাপূর্ণা মাতাজীর কৃপায়। আশাপূর্ণা মাতাজী আমাদের রক্ষা করেন, রাজাকেও রক্ষা করেন, গরু ছাগল ভেড়া ঘোড়া সবই তিনি রক্ষা করেন। দুঃখে কষ্টে আপদে আশাপূর্ণা মাতাজী এক মাত্র আশ্রয়। ওখানকার মোহন্ত মহারাজরা কাউকে পরোয়া করেন না। কেউ কোনও মুশকিলে পড়লে ওখানে গিয়ে পড়, একটা না একটা উপায় হয়েই যায়।

পরমানন্দজীর কথা মনে পড়ে গেল। পরমানন্দজী বলেছিলেন, আশাপূর্ণার মন্দিরে আবার সাক্ষাৎ হবে। আশাপূর্ণার মন্দিরটা কোথায় ! পরমানন্দজীকে সংবাদটা জানাতে পারলে হয়তো একটা ব্যবস্থা হত।

আশাপূর্ণার স্থানটা কতদূর জিজ্ঞাসা করলাম। নাথুরাম বললেন—খুব কাছেই। আশাপূর্ণার মন্দিরে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে এক বেলা লাগবে। ঘোড়ায় গেলে দু ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া আসা যায়।

লাফিয়ে উঠলাম—দু ঘণ্টার মধ্যে আসা যাওয়া হবে ! ঘোড়া একটা কোথায় পাওয়া যাবে ? টাকা যা লাগে দোব। একটা ঘোড়া চাই। এখুনি আমাকে যেতে হবে সেখানে, না গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বৃদ্ধ নাথুরামও খাড়া হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে ? কে কি মুশকিলে পড়ল ? বিমার না জখম ? সাপে কেটেছে বুঝি কাউকে ?

সংক্ষেপে তখন জানালাম সব। এ কথাও জানালাম যে পরমানন্দ-

জীর সঙ্গে আমরা নৌকায় এসেছি করাচী থেকে। পরমানন্দজীর সঙ্গে পরিচয় আছে। তাঁকে একটা সংবাদ দিতে পারলেই হয়তো এই বিপদ থেকে মুক্তি পাব।

নাথুরামজী একটুও উত্তেজিত হলেন না। ছেলেদের সঙ্গে সামান্য দু-চার কথা আলাপ করে আমায় বললেন—আপনার যাবার দরকার নেই, আমার ছেলে যাচ্ছে। দু ঘণ্টার মধ্যে ঘোড়ায় চেপে যাওয়া আসা করতে পারবেন না আপনি। মাঠ দিয়ে সোজাসুজি আমার ছেলে চলে যাবে। আমাদের সঙ্গে দুটো ঘোড়া আছে। এখনিই সে রওনা হচ্ছে। চলুন, আপনি আর আমি সেই নৌকাওয়ালাদের গ্রামে যাই। সেখানে মাতাজী পড়ে আছেন, আপনাকে না দেখতে পেলে তিনি হয়তো অস্থির হয়ে উঠবেন।

মিনিট দশেকের মধ্যে কুচকুচে কালো একটা টাট্টুতে চেপে নাথুরামের এক ছেলে ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল। হাঁ করে তাকিয়ে দেখলাম ঘোড়ায় চড়া কাকে বলে। শুধু একখানা কম্বল পড়ল ঘোড়ার পিঠে তার ওপর লাফিয়ে উঠল সওয়ার। দু পায়ে সাঁড়াশির মত আঁকড়ে ধরল পেটটা, এক হাতে খামচে ধরল ঘোড়ার ঝুঁটি। লাগাম ফাগাম কিছু নেই, এমন কি এক গাছা দড়ি পর্যন্ত নয়। ঘোড়া ছুটল, ছুটল না বলে বলা উচিত উড়ল। লেজটা খাড়া করে তীরবেগে বেরিয়ে গেল নজরের সীমানা ছাড়িয়ে। পিঠে যে একটা মানুষ লেপটে রয়েছে, বোঝাই গেল না।

## ॥ চৌদ্দ ॥

আমরাও শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম আশাপূর্ণার আশ্রয়ে। সেই দিনই দুপুরের শেষে পৌঁছে গেলাম। পরমানন্দজী বলেছিলেন—ভক্তি ভণ্ডামি ভাঁওতা দেখবার আশায় আশাপূর্ণার আড্ডায় না যাওয়াই ভাল। তাই-ই হল, কোনও রকমের আশা বাসনা নিয়ে যেতে হল না সেখানে, স্রেফ পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে হল, বাবা কোটেশ্বরের কোট থেকে নিস্তার পাবার আশায় প্রাণ নিয়ে দৌড়তে হল। মাথায় থাকুন বাবা, আপনি বাঁচলে তবে তো বাবার নামটা বজায় থাকবে।

কোটেশ্বর মানে জিদেশ্বর। জিদ জিদ আর জিদ, কোটেশ্বরের কৃপায় সবায়ের ঘাড়ে জিদ চেপেছে। বাবার চেলারা জিদ করে বসেছেন, যাত্রী দুটোকে তাঁদের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে। যবনত্ব ঘোচাবার জন্যে মানুষে কোটেশ্বরে যায়, গিয়ে লোহাপোড়া ছেঁকা খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে। আর এই বেতমীজ যাত্রীদুটোর এত বড় স্পর্ধা যে কোটেশ্বরের কোট থেকে পালিয়ে গিয়ে যবনদের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। সুতরাং দাও ওদের ফিরিয়ে আমাদের হাতে, আমরা ওদের চরম প্রায়শ্চিত্তটা করিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি! হয় ফিরিয়ে দাও; নয় তো তোমাদের দায়ী হতে হবে হিন্দু যাত্রীদের ধরে নিয়ে গিয়ে জাত মারবার জন্যে। ঘর দরজা পুড়িয়ে দেওয়া হবে, দূর করে খেদিয়ে দেওয়া হবে কোটেশ্বরের কূল থেকে। আরও কত কি শাস্তি হবে, তার হিসেব নেই। রাজকর্মচারীদের কাছে নালিশ করবার জন্যে লোক পাঠানো হয়েছে, দেখ কি হয়। আপাততঃ তোমাদের খাবার জল বন্ধ করা হল।

যাদের নামে নালিশ করবার জন্যে লোক গেছে, তাদের জিদ আরও সাংঘাতিক। তারা চায় খেসারত। একটা জেনানার নাকের ওপর লোহা পুড়িয়ে চেপে ধরা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের দশটা মরদের কপালে নাকে গালে ছেঁকা দোব তবে ছাড়ব। এসো, দশ জন এগিয়ে এসো। নাও ছেঁকা আমাদের সামনে, হয় ছেঁকা নাও, নয়ত পিটিয়ে সবাইকে লাশ বানিয়ে ছাড়ব। কাপ্তেন সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে জাঁকিয়ে বসে আছেন, প্রতিশোধ না নিয়ে কিছুতেই উঠবেন না।

উঠবেন কেমন করে, বাজারের কারবারী মানুষরা ওধারে আগুনে ফুঁ দিচ্ছেন। দেব দ্বিজে তাঁদের অশেষ ভক্তি, সিন্ধ, পাঞ্জাব রাজস্থান থেকে এসে তাঁরা কারবার ফেঁদে বসেছেন। বাহির বিশ্ব থেকে বহু বে-আইনী মাল এনে তাঁদের কাছে জলের দামে বেচে দেন কাপ্তেন সাহেবরা, সেই মাল তাঁরা দেশের ভেতর ন্যায্য মূল্যে পাচার করেন। শাঁসালো কারবার, কিন্তু দেব দ্বিজদের মোটা হাতে যখন তখন পূজা দিতে হয়। তাই তাঁরা চান, এই মওকায় দেব দ্বিজের পিঠে উত্তম-মধ্যম কিছু পড়লে তাঁদের ভক্তিটাও বজায় থাকে, বুকের জ্বালাও একটু জুড়োয়। সেই চেষ্টাই করেছেন তাঁরা, দু পক্ষকেই তাল বুঝে তাতাচ্ছেন। ফল কিন্তু কিছুই হচ্ছে না, দু পক্ষেই স্রেফ গর্জন করে চলেছে। অর্ধেক রাত থেকে চলেছে গর্জন, শুধু বচন বচন আর বচন। বচনের ওপর কোনও পক্ষই এগোতে পারছে না।

ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড ঘটে বসেছে। যাঁর নাকে ছেঁকা দেওয়ার দরুন এতসব কাণ্ড, সেই জেনানাটি ছুটতে ছুটতে এসে আছড়ে পড়েছেন বাবা কোটেশ্বরের দরজায়। পড়েছেন তো পড়েই আছেন মুখ গুঁজড়ে উপুড় হয়ে। দরজা জুড়ে পড়ে আছেন, ফলে মন্দিরের

মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বন্দী হয়েছেন। বাইরে থেকে কারও মন্দিরে প্রবেশ করার উপায় নেই। গেরুয়া পরা একটা জেনেনাকে ডিঙিয়ে যাওয়াটা ঠিক উচিত হবে কি না, কেউ ভেবে উঠতে পারছে না।

জিদ, সর্বনেশে জেনানী জিদ। চেঁচামেচি শাসানি গালাগালি, সর্বরকমের অহিংস পন্থা বিফল হয়েছে, জেনানী জিদ কি যা তা কথা। কাপ্তেন সাহেবরা তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছেন, একটিবার কেউ ছুঁয়েছে জেনানাটিকে তো আর রক্ষে নেই। সড়কি বল্লম লাঠি মায় তলোয়ার পর্যন্ত প্রস্তুত, কোটেশ্বরের এবড়ো খেবড়ো পাষাণ অঙ্গন থেকে যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত ময়লা নররক্তে সাফ হয়ে যাবে।

দম আটকানো চরম মুহূর্তটি থমকে রয়েছে দেবস্থানে, আমি আর নাথুরামজী দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে পেঁাছলাম তার মাঝখানে। নৌকাওয়ালাদের গ্রামে গিয়ে যখন শুনলাম, হুঁশ ফিরে আসতেই ভৈরবী মন্দিরের দিকে ছুটে গেছেন, তখন আমাদেরও আর হুঁশ জ্ঞান রইল না। বৃদ্ধ নাথুরামজী কি রকম একটা বিদকুটে চিৎকার করে উঠলেন। পর মুহূর্তেই আমার হাত একখানা ধরে দৌড়তে শুরু করলেন। তার পর যখন হুঁশ হল তখন দেখি মন্দিরের সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়েছি। বিস্তর মানুষ চারিদিকে, যুযুধান সবাই। এ ধারে বুক ফাটার মত অবস্থা তখন, অতখানি দৌড়ে গিয়ে দম ফেলতে পারছি না। শেষ সিঁড়িটার ওপরে বসে পড়লাম বুক চেপে। সামান্য ক্ষণের জন্যে প্রত্যেকের গলাই বন্ধ হল, হাঁ করে সবাই তাকিয়ে দেখতে লাগল' চোখের সামনে দম ফেটে মারা যাচ্ছে দুটো লোক, এ দৃশ্য দেখতে দেখতে বোধ হয় কেউ তড়পাতে পারে না।

তার পর উল্লাস। জাল কেটে পালানো শিকার স্বেচ্ছায় ফিরে এসে ধরা দিলে ব্যাধেদের উল্লাস হবেই। সেই উল্লাসের মাঝখানেই হিসেব-নিকেশ করে জানানো হল আমাকে প্রায়শ্চিত্তের পরিমাণ। একশ এক টাকার পূজা দিতে হবে, দক্ষিণা দিতে হবে পঞ্চাশ এক টাকা। তার পর ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্যে দিতে হবে এক কুড়ি এক টাকা। ছেঁকা তো আছেই, দু হাতে পাকা ছাপ নিতে হবে।

কাপ্তেন সাহেব স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন। জম্‌শেদ্‌ দু লাইনের একটি কবিতা আওড়ে তার ব্যাখ্যা করলেন। দোস্তি ভুলে যাও, মহব্বত মুছে ফেল মন থেকে, শুধু আফসোস করো না বন্ধু। দুনিয়ার মালিক দীন নন, আফসোস করলে তাঁর মহব্বতের অমর্যাদা করা হয়।

মাথা হেঁট করে বসে রইলাম। প্রায়শ্চিত্ত মানে আফসোস, পাপ করেছি মেনে নিয়ে মানুষে প্রায়শ্চিত্ত করতে বসে। কি পাপ করেছি যে প্রায়শ্চিত্ত করতে যাব! প্রায়শ্চিত্ত মানে ঘুষ দেওয়া, ঘুষ দিতে যাব এদের!

হঠাৎ মনে হল ঘুষ দেবার উপযুক্ত অর্থ ভৈরবীর কোমরে বাঁধা রয়েছে। করাচীর কূলে যে পরিমাণ প্রণামী পেয়েছিলাম, তা ওদের দাবির চেয়ে অনেক বেশী। লম্বা সরু থলেতে সেটা বাঁধা আছে ভৈরবীর কোমরে। করছি প্রায়শ্চিত্ত, ঐ আপদ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ প্রায়শ্চিত্তের ভয় ঘুচবে না।

উঠে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে কোটেশ্বরের দরজায়, নীচু হয়ে ভৈরবীর গায়ে ধাক্কা দিলাম। সাড়া পেলাম না। বসে পড়লাম পাশে, কাপড়ের ভেতর হাত চালিয়ে ফাঁস খুলে এক টানে থলেটাকে বার করে আনলাম। প্রত্যেকটি মানুষ দম আটকে তাকিয়ে আছে। দেখছে

সবাই লম্বা গেঁজেটাকে। দেবে নিশ্চয়ই প্রায়শ্চিত্তের দাবি মিটিয়ে, মুক্তি কিনে নেবে। কত টাকা আছে লম্বা গেঁজেটাতে, তাই বা কে জানে।

সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে এক হাতে দোলাতে লাগলাম গেঁজেটাকে দোলাতে দোলাতে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম জম্‌শেদ্‌ সাহেবের গায়ে। দিয়ে হেঁকে বললাম—গোনো, গুনে দেখো দোস্ত, ওতে কত টাকা আছে। ঐ টাকা তোমাদের দিচ্ছি, ওই দিয়ে তোমরা একটা নলকূপ বানিয়ে নেবে। একটা নলকূপ হলে তোমাদের আর এই মন্দিরের ইঁদারা থেকে জল নিতে হবে না। আমি জানতে পেরেছি, তেষ্টার পানির জন্যে তোমরা ভয়ানক তকলিফ পাও। মন্দিরের ইঁদারা তোমরা ছুঁতে পার না, পানি নিতে এসে মা-বোনেরা বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। দয়া করে যতক্ষণ না কেউ তুলে দিচ্ছে ততক্ষণ তোমাদের তেষ্টার পানি পাওয়ার উপায় নেই। বাবা কোটেশ্বর মেহেরবান, মেহেরবানের মেহেরবানিতে তোমাদের পানির কষ্ট ঘুচল।

এ পক্ষ ও পক্ষ দু পক্ষই চুপ। আচমকা অমন একটা কাণ্ড ঘটবে, কোনও পক্ষই তা আন্দাজ করতে পারে নি।

ঘুরে দাঁড়ালাম দ্বিজদের দিকে। দু হাত জোড় করে বললাম—আর এক কড়িও নেই আমাদের কাছে। আমরা ভিখারী, মাঙি খাই পথে পথে ঘুরে বেড়াই। কিছুই নেই আমাদের, প্রায়শ্চিত্তের টাকা কোথা থেকে দোব ?

এক সঙ্গে অনেক মুরব্বী গর্জন করে উঠলেন—চালাকি পেয়েছ ব্যাটা, টাকাগুলো হাতছাড়া করতে গেলে কি মতলবে ? ভেবেছ, আমরা ছেড়ে দিলে ওদের কাছ থেকে টাকাটা ফিরিয়ে নেবে ? সে উপায় নেই, টাকা না দিয়ে এক পা নড়তে পারবে না।

বললাম—আজ্ঞে না, অমন বদ মতলব এক দম নেই। এই মন্দিরেই আমরা পড়ে থাকব চিরকাল, বাবার প্রসাদ পাব। দিব্যি জীবনটা কেটে যাবে। কোনও চুলোয় আমাদের ঘর বাড়ি নেই, পালিয়ে যাব কোথায়। আপনারা আদেশ করছেন এখানে থাকবার জন্যে, রয়ে গেলাম। চিরকালের জন্যেই রয়ে গেলাম। আপনারা তাড়িয়ে দিলেও আর যাচ্ছি না।

ব্যাপারটা বুঝতে এবং হজম করতে বিলম্ব হল একটু ওঁদের, তার পর আরও খানিক সময় ব্যয় হল পরামর্শ করতে। পরামর্শ করে ঠিক হল যে আমাদের তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত। তখন হুকুম হল—নে ব্যাটা, তোল ঐ জেনানাটাকে। দূর হয়ে যা এখান থেকে। ফের যদি কখনও তোদের দেখা যায় এখানে তো মেরে হাড় ভেঙে দেওয়া হবে।

অতিরিক্ত রকম বিনয় প্রকাশ করে বললাম—ও হুকুমও পালন করতে পারব না হুজুর। ও এক ভিখিরী আমি আর এক ভিখিরী। ও আমার কথা শুনবে কেন। ভিখিরীরা প্রত্যেকেই স্বাধীন, কেউ কারও হুকুম মানে না। আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন, আমি চলে যাচ্ছি। ও কি করবে না করবে তা আমি বলতে পারব না।

বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম।

ছুটে এসে দু জন পথ আগলাল। দূর থেকে একজন হুকুম দিল—মার, মার ব্যাটাকে। হারামজাদা এখেনে চালাকি মারতে এসেছে।

খপ করে দু পাশ থেকে দু জনে ধরলে দুখানা হাত। হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন কাপ্তেন সাহেবরা। দূরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল, খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে কারা যেন এগিয়ে আসছে।

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন ভৈরবী, ছুটে এসে সিঁড়ির ওপর পেঁাছলেন। দ্বিজগণ চিৎকার করে উঠলেন, কি যে বললেন কিছুই বোঝা গেল না।

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ খুব কাছে এসে থেমে গেল। পরমুহূর্তে দেখা গেল, পাগড়ি পাঞ্জাবি পরা চার মূর্তি এগিয়ে আসছেন। কাপড় জামা পাগড়ি সবই রক্তবর্ণ, প্রত্যেকের মুখেই কালো কুচকুচে চাপদাড়ি। প্রত্যেকের হাতে আড়াই হাত লম্বা এক-একখানি লাঠি। এগিয়ে এলেন ওঁরা সোজা সিঁড়ির সামনে, ওদের দেখা মাত্র আমার হাত তুখানা ছেড়ে দিয়ে দ্বিজ তু জন সরে দাঁড়িয়েছিল। ওঁদের কিন্তু নজর ছিল, তার ফল ফলল আচমকা। একই সঙ্গে একই রকম শব্দে তু জনের গণ্ডে তুটি চড় পড়ল। চড়ের শব্দে কানে তালা ধরে গেল প্রায়। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, সেই সাংঘাতিক চপেটাঘাত খেয়ে লোক তুটো পড়ে গেল না। তু হাত পিছিয়ে গালে হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ওঁরা বেশী কথা বলার মানুষ নন। জিজ্ঞাসা করলেন একজন আমাকে—আপনাদের মাল পত্র কোথায়?

বললাম—কিছু নেই।

আর একজন বললেন—চলুন তা হলে আপনারা। পরমানন্দজী পাঠিয়েছেন আমাদের। আর দেরি করা উচিত নয়, যেতে যেতে বিকেল হয়ে যাবে।

নেমে এলম সিঁড়ি দিয়ে। এ পক্ষ ও পক্ষ কোনও পক্ষের পানেই তাকালাম না। দরকার নেই, পথের পরিচয় পথের প্রেম ভালবাসা দয়া মমতা আর নীচতা নিষ্ঠুরতা বেহদ্দ হ্যাংলাপনা পথেই পড়ে থাকুক।

এগিয়ে চল, সামনেই আশাপূর্ণার সংসার। আশাপূর্ণার সংসার থেকে আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে দূত এসেছে। পেছন দিকে তাকালে আশা পূর্ণ হবে না।

॥ পনেরো ॥

১৩৫৩ সাল, ভাদ্র মাস। কচ্ছের পশ্চিম প্রান্তে দেবাদিদেব কোটেশ্বর ভৈরব দর্শন হওয়ার পর মহামায়া হিংলাজ দর্শন ষোল আনা সুসম্পন্ন হল। আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র তিনটি মাস নিশ্চিন্ত হয়ে কায়ার দ্বারা মনের দ্বারা এবং বচনের দ্বারা তীর্থ সেবা করার পর বেঁচে থাকার নতুন একটা উদ্দেশ্য খুঁজে বার করতে হবে। নির্জলা বিনা কারণে বাঁচার চেয়ে মরণ ঢের ভাল, এটা শুধু কথার কথা নয়। কথাটার সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে চান যদি, বিনা উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে দেখুন। দেখবেন, অসম্ভব ব্যাপার। কয়েক দিন না যেতে যেতেই হয় কবিতা লিখতে শুরু করেছেন, নয় তো এক মস্ত ওস্তাদজীর কাছে ধ্রুপদী তালিম গ্রহণ করছেন, কিংবা ছবি আঁকতে লেগে গেছেন। করছেনই একটা না একটা কিছু, নিজের জন্যে যদি না করেন পরের জন্যে করছেন। নিষ্কর্মা হয়ে কিছুতেই কেউ বাঁচতে পারে না, শেষ পর্যন্ত কি করলে আশপাশের মানুষে খানিক উস্তন্‌খুস্তন্‌ হয় তার উপায় ঠাওরাতে বসে যায়।

এই যে ব্যাধি, কাজ না করলে কিছুতেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, এই যে মানসিক ধড়ফড়ানি এর মুলটা কোথায়।

ব্যাধিটা চিনিয়ে দিলেন পরমানন্দজী, তাই তাঁর কাছেই জিজ্ঞাসা করলাম মুক্তির উপায়। আকাশ থেকে পড়লেন একেবারে—কেন! এখানে আপনার কি এমন অসুবিধে হচ্ছে মহারাজ! নিশ্চয় হচ্ছে অসুবিধে, বলুন এখনই, দেখি কি করতে পারি।

বললাম—একদম এক ছিটে অসুবিধে হচ্ছে না, সেইটেই ভারী অস্বস্তি বলে মনে হচ্ছে। পনেরো দিন তো হয়ে গেল আর কত পারা যায়। একটা কিছু করতে দিন যা নিয়ে খানিকটা তবু—

পরমানন্দ বললেন,—খানিকটা তবু কি ? খানিকটা ঘাম ঝরাতে চান ? বেশ তো বাগান করুন না আমাদের সঙ্গে ! আমরা সবাই রোজ খানিকটা সময় বাগানের কাজ করি। কাল থেকে আপনিও আসুন আমাদের সঙ্গে, দেখবেন কি মজা। কপি আলু পালং টম্যাটো—

হার মানলাম। কপি, আলু, পালং বাজারে মেলে, না মিললেও আমার দুঃখ নেই। খিদে যখন পায়, তখন খাবার মত কিছু একটা পেলেই খাই। খানিকটা খেতে খেতে খিদে থাকে না। হাঙ্গামা চুকে যায়। তার পর ও নিয়ে মাথা ব্যথা করার মত মাথা আমার ধড়ের ওপর নেই। সেই কথাটাই বুঝিয়ে বলতে গেলাম পরমানন্দজীকে—হাঁ, তা না হয় বাগানের কাজেই লাগব কাল থেকে। কিন্তু ও আর কতটুকু বলুন, ওতে আছেই বা কি। কয়েক কোদাল মাটি কোপালেই কি মনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব। মন যা চাইছে, তার সন্ধান কি করলে পাওয়া যায় সেই উপায় বাতলান।

মন আপনার কি চাইছেন ? পরমানন্দজীর চোখে সেই অদ্ভুত আলোটা চিকচিকিয়ে উঠল। বললেন—কি চাইছেন আপনার মন ? রহস্য ? প্যাঁচ ? সাদাসিধে ব্যাপারটাকে অবিশ্রান্ত জট পাকাতে আর

সেই জট ছাড়াতে গিয়ে হিমশিম খেতে পারলে মন আপনার শান্ত হয়। সাদা ব্যাপার হল, আপনি বেঁচে আছেন। যতদিন না মরবেন, ততদিন বেঁচে থাকবেনও। এই বাঁচার মেয়াদটাকে পাঁচ রকমের পাঁচটা সমস্যার ভেতর জড়িয়ে না ফেলতে পারলে সুখ পান না। এখানে এসেছেন, নিশ্চিন্ত হয়ে কয়েকটা দিন খেয়ে ঘুমিয়ে শান্তিতে কাটিয়ে দিয়ে যাবেন। কিন্তু মন উঠছে না আপনার, কই রহস্য কোথায়! তন্ত্র সাধনাটা হচ্ছে কোথায়! এরাও তো দেখছি, দিব্যি খায় দায় ঘুমোয়। তা হলে কাজের কাজগুলো কি লুকিয়ে করে! কি সেই কাজের কাজ! কেমন তার—

বাধা দিয়ে বললাম—না না আপনাদের গুপ্ত আচার অনুষ্ঠানের ভেতর যাওয়ার জন্যে—

পরমানন্দ বললেন—গুপ্ত নয় প্রকাশ্য। সবই আমাদের প্রকাশ্য সাধনা। আলো হাওয়া জল এ যেমন সকলের সম্পত্তি আমাদের সাধনাও তেমনি সবায়ের জন্যে। গালভরা বুলি, অধিকারী অনধিকারী ভক্তি বিশ্বাস, ত্যাগ বৈরাগ্য ও সমস্ত হেঁয়ালির ধার আমরা ধারি না। সবাই অধিকারী, সুস্থ চিত্তে বেঁচে থাকার অধিকার সকলের আছে। সুস্থ চিত্তে বেঁচে থাকতে হলে যা করা প্রয়োজন তার নামই তান্ত্রিক সাধনা। সেই সাধনা আমরা সবাই করছি।

চুপ করতে হল। পনরো দিন ধরে দেখছি, সকাল সন্ধ্যা সর্বক্ষণ দেখছি, সবাই ব্যস্ত। বিরাট সংসার আশাপূর্ণা দেবীর। সব শুদ্ধ হাজার খানেক স্ত্রী-পুরুষ কাচ্চা বাচ্চার সংসার। রাস্তা ঘাট ঘর বাড়ি পরিষ্কার রাখা, রাস্তায় বাতি জ্বালানো থেকে শুরু করে, বাচ্চাদের স্কুল চালানো পর্যন্ত সমস্ত কাজ এঁরা করছেন। ঝাড়ু দেবার জন্যে

আলাদা জাতের লোক নেই, কাপড় ধোওয়ার জন্যেও নেই, জাত বলতে কিছু নেই। যে মেয়েটিকে কাল দেখলাম মায়ের মন্দিরে বসে চন্দন ঘষতে, আজ সকালে তাকেই দেখছি কোমর বেঁধে রাস্তায় ঝাড়ু দিতে। কপালে ত্রিপুণ্ড্রক চড়িয়ে কাল যিনি মায়ের সামনে আসনে বসে নিখুঁত ভাবে পূজা করছিলেন, আজ তিনি ঠেলা গাড়িতে ময়লার টব তুলে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছেন। স্বয়ং পরমানন্দজীর ব্যাপারও গোলমেলে। দেখলে মনে হবে উনিই ওখানকার কর্তা। বাইরে থেকে লোকজন এসে ওঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন, ওঁর আলাদা আসন রয়েছে, লাইব্রেরী রয়েছে, অফিস রয়েছে। কিন্তু অত সব থাকতেও ওঁর কিছুই নেই। নির্দিষ্ট সময়ে উনি ওঁর গদির ওপর বসেন একটি বার—সামান্য সময় বাইরের লোকদের দর্শন দেন। তার পর কাজ, সব রকমের কাজ। গরু আছে এন্তার, তাদের জন্যে খুবই আধুনিক ফ্যাশানের গোয়াল আছে। তাদের জন্যে ছোট হাসপাতালও রয়েছে। পরমানন্দজী সেই গরুগুলোকে নিয়ে পড়ে আছেন। হুকুম করে লোক খাটাচ্ছেন না, নিজে খাটছেন সবায়ের সঙ্গে সমানে। গোবর পরিষ্কার নিজে করেছেন, গরুদের স্নান নিজে করাচ্ছেন, নিজে তাদের খাওয়াচ্ছেন। আশাপূর্ণার সংসারে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত যাবতীয় কাজ সবাই করে যাচ্ছে পরম তৃপ্তিতে। একটি মাত্র কাজ করার মানুষ নেই সেখানে, হুকুম করবার মানুষ নেই। কেউ কাউকে কিছু করবার জন্যে হুকুম করে না। কারণ হুকুম করে তো আর কাউকে দিয়ে কোনও রকম সাধনা করানো যায় না।

আশাপূর্ণার সংসার। দেবীর নাম আশাপূর্ণা। কচ্ছ মহারাজার কুলদেবী। নবরাত্রিতে ভয়ানক রকম ধুমধাম হয়, স্বয়ং মহারাজ চলে আসেন আত্মীয় পরিজন নিয়ে। শত্রু ক্ষয় এবং যুদ্ধ জয় এই দুই কামনায় মহাদেবীর মহাপূজা হয়। অজস্র বলিদান দেওয়া হয় ন দিন, মায়ের রক্তস্নান হয়। ন দিন ন রাত মায়ের সংসারে কোনও নিয়ম কানুন থাকে না। তার পর যে যার স্বস্থানে চলে যায়। মা আশাপূর্ণা তাঁর ছোট্ট সংসারখানিকে গুছিয়ে নিয়ে শান্তিতে বাস করেন।

দেবী ব্যাঘ্রবাহিনী। কচ্ছের যাবতীয় গুলবাঘ দেবীর বিশেষ রকম অনুগৃহীত। কচ্ছ মহারাজার এলাকায় বাঘ মারার হুকুম নেই। একবার নাকি কোথাকার এক সাহেব এসে মেরেছিল একটা বাঘ। ফল সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াল, আশাপূর্ণা মায়ের বিশাল পাষাণ শরীর থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। ছুটে এলেন মহারাজা সংবাদ পেয়ে, হত্যে দিয়ে পড়ে রইলেন মায়ের সামনে। হুকুম হল, নররক্তে মাকে স্নান করাতে হবে, নরমাংসে ব্যাঘ্রকুলের তর্পণ করতে হবে। তাই করা হল, এক শ আটটি নরবলি দেওয়া হল। মা তুষ্ট হলেন। বর্তমান মহারাজার বৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলে ঘটেছিল সেই ব্যাপারটা, মাত্র আড়াই শ বছর আগেকার ব্যাপার। তাই সেটা কেউ ভুলতে পারে নি। কচ্ছের যে কোনও গ্রামে গেলেই আশাপূর্ণার স্থানে একশ আট নরবলির ঘটনাটা সবাই শুনতে পাবে। সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে কিনা। কে জানে, আবার কবে আচম্বিতে কেউ একটা বাঘ মেরে বসবে। তা হলেই লাগল হুজ্জত, একটা বাঘের বদলে এক শ আটটা মানুষ জোটানো তো আর সোজা কথা নয়।

সোজা কথা দুনিয়ার কোথাও নেই। দেবতার মহিমা বোঝাবার

জন্যে, দেবতার অপার নিষ্ঠুরতা প্রমাণ করাই চাই। মানুষের চেয়ে দেবতা চরম অসহায়, মর্জি হলে মানুষ একটা দেশ বা একটা গ্রাম ধ্বংস করে আপন মহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। দেবতা তাও পারেন না, মানুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত যে কোনও রকম বীভৎস কাজকে নিজের কাজ বলে দাবি করে তার ফলভোগ করেন। যুগযুগান্ত এই-ই চলে আসছে। মানুষের ওপর নির্ভর করা ছাড়া দেবতার আর অন্য কোনও পথ নেই। যদি কখনও মানুষ খুনখারাপি করা ত্যাগ করে, সেদিন দেবমহিমাও ম্লান হয়ে যাবে।

পরমানন্দের সব চেয়ে কাছের মানুষ ধ্রুব মহারাজ। তিনি সন্ন্যাসী, তাঁর অঙ্গে রঙিন কাপড়। ধ্রুব মহারাজ বিজ্ঞানে শেষ পরীক্ষা দিয়ে এসেছেন। বয়স মাত্র ছাব্বিশ, চব্বিশ ঘণ্টা স্বহস্তে ঘোড়ার সেবা করেন। এক পাল ঘোড়াও আছে মায়ের সংসারে, বেঁটে বেঁটে আরবী টাট্টু, দানা-পানির পরোয়া না করে দু-চার দিন অনায়াসে সওয়ার পিটে নিয়ে ছুটতে পারে তারা। ধ্রুব মহারাজ ঘোড়াদের কর্তা, ঘোড়সওয়ারদেরও সর্দার। এক ঘর বল্লম তলোয়ারও ধ্রুব মহারাজের হেপাজতে থাকে। তোড়জোড় দেখে মনে হল, খুনোখুনি করবারও প্রয়োজন হয় ওঁদের মাঝে মাঝে। খামকা কি আর কেউ অস্ত্রশস্ত্রে শান দিয়ে এক পাল লড়ুয়ে ঘোড়ার তোয়াজ করতে থাকে!

যথেষ্ট হৃদ্যতা হল ধ্রুব মহারাজের সঙ্গে। বাঙ্‌লা দেশটা বিশেষতঃ কলকাতা শহরটা দেখবার শখ তাঁর অত্যন্ত তীব্র। কলকাতার গল্প করতে করতে হৃদ্যতা জমে উঠল। তাই একদিন সাহস করে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম—অত অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে করেন কি আপনারা? দেখে

মনে হচ্ছে, মাঝে মাঝে লড়াই করতেও নামতে হয়। আপনাদেরও তা হলে তুশমন আছে।

ধ্রুব মহারাজ বললেন—আমাদের তুশমন নয়, সবায়ের তুশমন। বাঙ্‌লা দেশে ডাকাত নেই? রাজস্থান বেশী দূর নয়, ওধারে সিন্ধু। তার ওপর সমুদ্র তো রয়েছেই! কাজেই মাঝে মাঝে খারাপ খবর আসে। তখন ছুটতে হয়। কোথাও ডাকাতি হয়েছে শুনলে আমরা দৌড়বই, আমাদের ঘোড়াগুলো ভয়ানক রকম তুখড়, তু-তিন দিন সমানে দৌড়ে ঠিক ডাকাত দলের নাগাল পাইয়ে দেবে। তু-একটাকে খতম করে মুণ্ড নিয়ে এলেই দেশের লোক সন্তুষ্ট, জ্যান্ত ধরে আনতে পারলে তো কথাই নেই। স্বয়ং মহারাজ এসে খুশী মনে মায়ের পুজো দেন।

খটকা লেগে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম—জ্যান্ত ধরে আনলে ডাকাতগুলোর বিচার হয় বুঝি? কে বিচার করেন?

পরমাশ্চর্য হয়ে পড়লেন ধ্রুব মহারাজ, সভ্য জগতের সভ্য বিশ্ব-বিদ্যালয় যাঁকে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ডিগ্রি দিয়েছে, তিনি হাঁ হয়ে গেলেন। ডাকাতদের আবার বিচার। বাঙ্‌লা দেশে কি ডাকাতদেরও বিচার হয়। ডাকাতরা কি বিচার বিবেচনা করে লোক খুন করে বেড়ায়! ডাকাতদের বিচার তো তারা নিজেরাই করে রেখেছে হয় মর নয় মার। জ্যান্ত ডাকাত ধরে আনলে তাকে দিয়ে মায়ের পুজো হয়। মুণ্ড কেটে আনলে মুণ্ডও মায়ের সামনে নিবেদন করে দেওয়া হয়। এর আর বিচার-আচার কি আছে?

টুঁ শব্দটি করতে পারলাম না।

তার পর আর মায়ের সামনে গেলাম না। মায়ের মন্দিরের সামনে

পাথরে বাঁধান উঠোনটাতে পা দিতে হবে তো। ঠিক ঐ খানেই এই সে দিন তিন তিনটে জ্যান্ত মানুষকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে এক এক চোপে কেটে ফেলা হয়েছে। হাঁ, এই সেদিন, সাত আট মাস আগে শীত কালে। ধ্রুব মহারাজই শোনালেন সেই গল্প। শীতকালেই ডাকাতরা বেশী আসে। মায়ের স্থান থেকে বত্রিশ মাইল দূরে একটা গ্রামে ডাকাত পড়ল। তার পর দিন সেই সংবাদ এসে পৌঁছিল আশাপূর্ণার সংসারে। সব সুদ্ধ আট জন আর আটটা ঘোড়া চলে গেল। সারা রাত ছুটে অকুস্থলে পৌঁছে ডাকাতদের পেছনে ধাওয়া করতেই লেগে গেল অনেকটা সময়। তার পর আড়াই দিন সমানে ঘোড়ার পিঠে বসে রইল সবাই, সব শেষে একটা পাহাড়ের মধ্যে মিলল ডাকাতদের সঙ্গে। জবর লড়াই হয়েছিল সেখানে। শেষ পর্যন্ত তিনটে জ্যান্ত ডাকাতকে ধরে আনা গিয়েছিল এই যা লাভ।

আপনাদের তরফে কেউ খুন জখম হয় না বুঝি! কথাটা জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারলাম না। ধ্রুব মহারাজ বললেন—হয় বৈকি দু-চার জন। তবে আমরা হার মানি না। গত বারেও তিনটে মানুষ আর তিনটে ঘোড়া ফিরল না। তা হোক, মায়ের পূজার জন্যে ডাকাত তিনটেকে তো পাওয়া গেল। আর মুণ্ডও এনে ছিল অনেক-গুলো। আমাদের লোকসান হয় নি।

লোকসান!

স্তম্ভিত হয়ে ধ্রুব মহারাজের জ্বলজ্বলে মুখখানির পানে তাকিয়ে রইলাম। এদের লাভ লোকসান জ্ঞানটা কত সূক্ষ্ম!

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ আশাপূর্ণার সংসারে দরকার করে

না। একটা বাঘ খুন করবার বদলে একশ আটটা মানুষ বলি দেওয়াটা যে অত্যধিক রকম বেহিসেবী ব্যবস্থা, সে কথা তাঁদের বোঝায় কে। মানুষ সস্তা, বাঘ সস্তা নয়। তা ছাড়া এমন মানুষ যে অনেক রয়েছে যারা একেবারে না থাকলে দেশের শান্তি দশেব শান্তি। সেই সব আগাছা বেখে লাভ কি। খামকা অষ্টপ্রহর তাদেব জন্যে জ্বালাতন না হযে সেগুলোকে শেষ করে দিলে কি দোষ হয। আগাছা যদি থাকে বাগানে, দেখবেন আস্তে আস্তে সমস্ত বাগানটাই তারা গ্রাস করে ফেলবে। আগাছা কি রাখতে আছে।

তাই আশাপূর্ণার সংসারে কাবাগার নেই, বিচারালয নেই। বিচারালয নেই বলে ঘুষও নেই। ঘুষ নেই বলে সাক্ষী দেবার মানুষও নেই। সাক্ষী নেই বলে উকিল মোক্তাব পুলিস দাবোগাও নেই। তুটো পযসা উপার্জনের কোনও ফিকিব নেই সেখানে। ফিকির নেই যে সমাজব্যবস্থায, সেখানে মানুষ শান্তিতে বাস করবে না কেন। অততেও যদি তুমি শান্তি না পাও, ভালয ভালয বিদেয় হও। বিদেয় না হয়ে যদি ওখানে বসেই তুমি ওখানকার শান্তিটুকু বিষিয়ে তোলবার চেষ্টা কর, তা হলে আব কি কবা যাবে। বোঝা যাবে, মায়ের মর্জি হয়েছে আর একটি নরবলি খাবাব, সুতরাং চল মায়ের সামনে। বিধিপূর্বক মন্ত্র পড়ে নিবেদন করে দেওয়া যাক। মায়ের মহিমা আর এক হাত বৃদ্ধি পাবে।

মায়ের মহিমায় মায়ের স্থানে অশান্তি থাকতে পায় না, অশান্তি মা গ্রাস করে ফেলেন।

ধরলাম একদিন পরমানন্দজীকে—এত নরবলি কেন? নররক্তে সত্যিই কি দেবী তুষ্টা হন?

পরমানন্দজী বললেন—তা আমি জানব কেমন করে। এই মঠে এই প্রথাটা বহু যুগ ধরে চলে আসছে। যাঁরা চালু করেছিলেন তাঁরা বোধ হয় জানতেন দেবী নররক্তে তুষ্টা হন কি হন না। আমরা ও নিয়ে মাথা ঘামাই না। প্রথাটা রয়েছে যখন, তখন থাকুক না। ক্ষতি তো কিছু করছে না।

ক্ষতি করছে না। প্রায় আর্তনাদ করে উঠে মুখ বন্ধ করলাম।

পরমানন্দজী বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার পানে। তার পর মাথা দুলিয়ে বললেন—করছে বৈকি। আজ এই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, ক্ষতি করছে। ঐ নরবলির ব্যাপারটা জানতে পেরে এত বেশী ব্যথা পেয়েছেন আপনি যে এখানে আপনার নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। খুবই চোট পেয়েছেন আপনি মনে, কাজেই খুবই ক্ষতি করছে।

বললাম—আমার কথা ছেড়ে দিন, আমি এখানে বেড়াতে এসেছি. দু-দশ দিন পরে চলে যাব। কিছুদিন পরে ভুলেও যাব এখানকার কথা। কিন্তু ধর্মের দোহাই দিয়ে দেবতার স্থানে এই রকম নৃশংস কাণ্ডকারখানা, এটা যে চালু থাকবে। মা করুণাময়ী, মায়ের কাছে লোকে আসবে মায়ের করুণা পাবার জন্যে, মাকে যমের মত ভয় করবার জন্যে নয়। মানুষ ধরে এনে কেটে ফেলা হয় শুনলে কোন মানুষের প্রাণে ভাব ভক্তি প্রেম করুণা বেঁচে থাকে। রাক্ষসীর কাছে তো লোকে আসে না, মায়ের কাছেই আসে। এই কি সেই মায়ের স্থান?

পরমানন্দ তৎক্ষণাৎ আমার কথায় সায় দিলেন। বললেন—আমিও ঠিক ঐ কথাই বলি। কেন রে বাপু, মানুষ মারতে হয়, দূরে কোথাও

মার। এই যে এত বড় যুদ্ধটা চলছে দুনিয়ায়, হাজার হাজার লক্ষ কোটি মানুষ মারছে আকাশ থেকে বোমা মেরে, সেই রকম ভাবে মারলেই হয়। মায়ের স্থানে ও হাঙ্গামা রাখা কেন। তা শুনবে নাকি কেউ আমার পরামর্শ। বলে, বেশ তো চলছে। মায়ের শাসনে কম অন্যায় কম চুরি চামারি ডাকাতি চলছে এ দেশে। মায়ের ওপর থেকে যেদিন লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা চলে যাবে, সেদিন এ দেশটাও বোম্বাই করাচী কলকাতার মত বজ্জাতের আড্ডা হয়ে উঠবে। আমি আর কি করতে পারি বলুন, এদেশের রাজার পুরুত বংশের ছেলে আমি। মাযের পূজাটা চালাই, আমার দিন চলে যায়। আমি কেন এ সমস্ত ব্যাপারে নাক গলিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনব। রাজা ইচ্ছে করলে আমাকে খেদিয়ে দিয়ে আর এক পুরুত রাখবেন। আমি কি আর কোনও প্রথা পালটাতে পারি।

বুঝলাম, এ ব্যাপার নিয়ে উনি আমার সঙ্গে আলাপ করতেও অনিচ্ছুক। ঠিক করলাম, এবার সরতে হবে। ভৈরবীর খোঁজ করলাম। এখানে পোঁছনো ইস্তক ভৈরবী চুটিয়ে সংসার করছেন। রান্না, বাসন মাজা, ঘর দরজা সাফ করা সমস্ত কাজ মহিলারাই করেন, ভৈরবীও তাঁদের সঙ্গে আছেন। কখন খান, কি খান, কোথায় ঘুমোন, জানতেও পারি না। জানবার চেষ্টাও করি নি। আমি যেখানে থাকি, যে বাড়িতে থাকি, সেখান থেকে অনেক তফাতে ভৈরবা থাকেন। নিশ্চিন্ত ছিলাম; আর নিশ্চিন্ত থাকা গেল না। ডাকিয়ে আনলাম একটা ছোট্ট মেয়েকে দিয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম—এখানেই থাকবে নাকি বাকী জীবনটা? এখান থেকে বেরতে হবে না?

ভৈরবী বললেন—কাজ শেষ হয়েছে আপনার? আপনার কাজ

শেষ হয়ে থাকলে এখানে আর থেকে লাভ কি? পুজোর সময় কাশীতে থাকলে বেশ হয়। পুজোও তো এসে গেল।

আমার কাজ! আকাশ থেকে পড়লাম—কি কাজ আমার!

—তা আমি জানব কেমন করে। সবাই বলে, তাই শুনি। এখানে নাকি আপনি এঁদের তন্ত্র শেখাচ্ছেন।

জবাব শুনে চুপ করে গেলাম। এ সমস্ত কথা এখানে কে কি উদ্দেশ্যে রটিয়েছে!

বিনা উদ্দেশ্যে। যেখানে সবাই বেঁচে আছে উদ্দেশ্য বিহীন হয়ে, সেখানে কেউ কোনও উদ্দেশ্যেই কিছু করে না। বিনা উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকার মত একটা অপার্থিব শক্তি এরা অর্জন করেছে। সেটি কি!

অবশেষে সেই শক্তির দর্শন পেলাম।

যেদিন চলে আসব, তার আগের দিন অর্ধেক রাতে পরমানন্দজী এসে চুপি চুপি ঘুম থেকে তুলে বললেন—চলুন। রহস্যটা না জেনে গেলে আপনার লোকসান হয়ে যাবে। জীবন-ভোর ভাববেন, আশাপূর্ণা মায়ের ওখানে অনর্থক অনেকগুলো দিন অপচয় হয়ে গেছে। চলুন, যা দেখতে এসেছেন, আজ দেখতে পাবেন।

চললাম।

আকাশে একটু একটু মেঘ জমছে তখন, ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘ আকাশময় চলে বেড়াচ্ছে। তার অনেক পেছনে মনমরা চাঁদ—ঘুমে ঢুলুঢুলু অবস্থায় জবুথবু হয়ে বসে আছে। আমরা দু জন পা চালালাম। আশাপূর্ণা মায়ের মন্দিরের চারিদিকে মানুষের বাস, তার পর খেত। সব পার হলাম। আরম্ভ

হল উঁচু নীচু এবড়ো-খেবড়ো নোড়ানুড়ির জঙ্গল। নীরবে আমরা পার হচ্ছি। প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটবার পরে দূরে একটা ছোট পাহাড় দেখা গেল। পরমানন্দ বললেন—ঐ পাহাড়টায় তলায় আমাদের পৌঁছতে হবে। এসে পড়েছি প্রায়, অর্ধেক রাত পার হলে তবে দর্শন দান করেন। শুকতারা ওঠা চাই। ব্রাহ্মমুহূর্তের আগেই আমাদের বিদেয় নিতে হবে। মনে মনে গুছিয়ে নিন আপনার প্রশ্নগুলো। যা জানতে চান তাও বলবেন। কোনও রকম দ্বিধা করবেন না।

জিজ্ঞাসা করলাম—ইনি কে ?

ওঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন—বলে খাড়া চড়াই উঠতে শুরু করলেন পরমানন্দজী। আমি ঠিক পিছনে আছি। চড়াইটা যেখানে শেষ হল, সেখানে থেমে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—এইবার আমার হাত ধরে আসুন, এবার নামতে হবে। খুব পুরনো সিঁড়ি, ভেঙেচুরে গেছে। সাবধানে নামবেন আমার হাত ধরে, আসুন।

তার পর নামা, চোখ বুজে নামা। সেই নামার শেষে সঠিক স্থানে পৌঁছনো গেল। চোখ মেলে দেখলাম। ছোটখাটো একটি রাজসভা বলা চলে। মোটা মোটা থামের মাথায় ছাত। প্রায় প্রত্যেকটি থামে এক-একটি প্রদীপ জ্বলছে। আলো তাতে বিশেষ হচ্ছে না, তবে অন্ধকারটা কতখানি অন্ধকার তা মালুম হচ্ছে। একটার পর একটা থাম পেরুতে লাগলাম, সর্বশেষে থামতে হল। আর এগোবার উপায় নেই, সামনে এক অন্ধকার পাষাণ।

পরমানন্দ বললেন—বসুন এখানে হাঁটু গেড়ে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলুন, মা দর্শন দাও। তুমি বলেছিলে, দর্শন দেবে, তাই এসেছি। মা দর্শন দাও।

যা বললেন পরমানন্দ ঠিক তাই করলাম। মনে মনে আকুল ভাবে বললাম, মা দর্শন দাও। একটি বার দর্শন দাও মা, নয়তো এ জীবন রাখব না। এখানে এসেও যদি তোমার দর্শন না পাই তা হলে—

তা হলে কি করব না করব বলতে হল না। আস্তে আস্তে সেই অন্ধকারে আলো দিয়ে গড়া এক মানুষী মূর্তি ফুটে উঠল। হাত চারেক সামনে শূন্যে স্থির হয়ে রইল সেই মূর্তি। মূর্তিটি আলোর তৈরী, শুভ্র জ্যোতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

পাশ থেকে পরমানন্দজী ধীরে ধীরে উচ্চারণ করতে লাগলেন—

স্বাহা স্বধা বষট্ রূপা শুভাং পীযূষ বাদিনীম্।
অক্ষরাং বীজ-রূপাঞ্চ পালয়িত্রীম্ বিনাশিনীম্॥

আমি মূক হয়ে গেলাম কি দেখছি, কি শুনছি, কিছুই তখন মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে না। ছোটখাটো এক মানবী মূর্তি, কমলালেবু রঙের আচ্ছাদনে মুখখানি ছাড়া সমস্ত দেহ আবৃত। চোখ দুটি ঘোর নীলবর্ণ অর্ধ নিমীলিত। ছোট্ট দেহটির ভেতরে যেন সাদা আলো জ্বলছে। এ কি কোনও পুতুল! না স্রেফ দৃষ্টি বিভ্রম! যা দেখছি, তা সত্যি দেখছি না, এইটা আঁকড়ে ধরে নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

তার পর কথা। পরিষ্কার হিন্দীতে মা বললেন—এই বাচ্চা যা দেখছে তা বিশ্বাস করতে পারছে না।

পরমানন্দজী বললেন— মা, তুমি ওকে বিশ্বাস করিয়ে দাও।

তখন সেই আলোক মূর্তি থেকে একখানি আলোয় তৈরী হাত বার হল। হাতখানি ধীরে ধীরে উঠল লম্বা হয়ে। তার পর সেই মূর্তিটি ভেসে এল আরও অনেক কাছে। হাতখানি ঠেকাল আমার মাথার

ওপর। সঙ্গে সঙ্গে যেন ঘুম ভেঙে গেল আবার। সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় মনে মনে বললাম—চৈতন্যরূপিণী, চৈতন্য দান করো।

আস্তে আস্তে অদ্ভুত মিষ্টি সুরে মা বলতে লাগলেন—তুমি আমি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যা কিছু দেখছ, সমস্ত আলো থেকে সৃষ্ট হয়েছে। আলোর সন্তান আমরা, আমরা জ্যোতির সন্তান। আসল তুমি ঠিক আমার মত। এখান থেকে মহাব্যোম, মহাব্যোম থেকে অনাদি অনন্ত মহাশূন্যে অবাধে বিচরণ করতে পার তুমি, যদি তুমি নিজেকে চিনতে পার। তোমার ঐ খোলসটা আসল তুমি নও। তোমার কামনা বাসনা সংস্কার গিয়ে গড়া আর এক খোলস আছে সেটাও তুমি নও। তার পর আসল তুমি—জ্যোতির সন্তান জ্যোতির্ময়। সূর্য থেকে সেই জ্যোতি সর্বত্র ছড়াচ্ছে, জ্যোতি রূপান্তরিত হয় না, জ্যোতি কখনও নিভেও যায় না। জ্যোতির স্বভাব বহু বিচিত্র রূপে প্রকাশ পাওয়া। এই-ই সৃষ্টির খেলা। নিজেকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করো। সমস্ত সংস্কার থেকে মুক্ত হবার জন্যে চেষ্টা করো। তা হলে আর শান্তি অশান্তি থাকবে না।

আর কি জিজ্ঞাসা করা যায়!

তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম—মা, সেটা কি এ জীবনে সম্ভব হবে!

মা অতি অপরূপ হাসি হাসলেন।

জ্যোতি মিলিয়ে গেল।

## ॥ ষোল ॥

আবার যাত্রা শুরু হল। এবং সেটি হল পরদিন সকালেই দুখানি কম্বল দুটি কমণ্ডলু দু প্রস্থ করে কাপড় চাদর দিয়ে দিলেন আমাদের পরমানন্দজী। যা কিছু জুটেছিল তা তো সব কোটেশ্বরের ওখানেই রয়ে গেছে। নতুন কাপড় চাদর চড়িয়ে নতুন কম্বল ঘাড়ে নিয়ে রওনা হলাম। প্রথমে ভুজ পর্যন্ত পায়ে পায়ে, তার পর রেলে চেপে সমুদ্রের কিনারায়। স্টীমারে সমুদ্র পার হয়ে মহালক্ষ্মী বন্দর। কাথিওয়াড়ে পেঁ‍ৗছে গেলাম। নবরাত্র সেবার জুনাগড়ে কাটে।

আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে আমি জ্যোতির সন্তান, আমার আসল রূপ জ্যোতির রূপ।

মা আশাপূর্ণার জ্যোতির্ময়ী রূপ আমি দর্শন করেছি। মা অভয় অভয় দান করেছেন।

হবে, নিশ্চয়ই হবে। একদিন না একদিন ঠিকই নিজেকে চিনে উঠতে পারব।

—সমাপ্ত—